মুখর মৃত্যু স্তব্ধ জীবন

পরিবেশক

সাহিত্যশ্রী

৭৩, এম. জি. রোড

কলিকাতা-৯

MUKHAR MRITYU STABDHA JIBAN

A Psychological Novel By

Manab Gangopadhyay

প্রকাশক : শ্রী শ্যামল ঘোষ
ঘোষ পাবলিশিং কনর্সান
৭৩, এম.জি. রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০

লেজার টাইপ সেটিং
লেজার কাম্পাস
১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

মুদ্রক : নিউ প্রিন্টার্স
১১২/১২ বেলেঘাটা মেন বোড
কলিকাতা-৭০০ ০১০

মুখর মৃত্যু স্তব্ধ জীবন

চাপা-উদ্বেগে বিনয়বাবু আজ সকালে ভাল করে বেড়াতে পারেননি। বৈশাখী-সকালের স্নিগ্ধ বাতাস আজ একবিন্দুও মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি। ঠিক যে মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি একথা বলা ঠিক হল না। বাড়ি থেকে সকালে বের হওয়া মাত্র শরীর শীতল হয়ে উঠেছে অথচ এই স্নিগ্ধ শীতলতা আজ তিনি স্বীকার করতে পারলেন না। মনে শান্তি নেই বলে শরীরের শান্তি হওয়াকে তিনি ন্যায্য বলে ভাবলেন না। ভোরের বাতাস একজন সমঝদার একদিনের জন্যে হারাল। অন্যান্য বৃদ্ধদের সংগে পার্কে বসে রোদ ওঠা পর্যন্ত গতকালের রাতের শেষ সংবাদ নিয়ে—অর্থাৎ রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় আজ বিনয়বাবু একেবারে কোন কথা বলতেই পারলেন না। এমনিতেই স্বল্পবাক বিনয়বাবু—কিন্তু আজ যেন বেমানানভাবে বোবা। পার্কের সঙ্গীসাথীদের কাছে বেঞ্চিতে বসে বাড়িতে ফেরবার জন্যে ছটফট করেন—অবশেষে অসময়ে অকালে উঠে দাঁড়ান—ফেরবার পথে মনে হয় নিজের বাড়ির ওপর এমন বিতৃষ্ণা বোধ হয় তাঁর এর আগে কোনদিন হয়নি।

এখনও বিনয়বাবুর বাড়িতে ঘুম থেকে কেউ ওঠেনি। ঘুমন্ত বাড়িতেই তিনি আবার প্রবেশ করলেন। জামা কাপড় ছাড়লেন—হাতপা ধুলেন। চিরকালের অভ্যাস। বাইরে থেকে এসে জামা কাপড় ছাড়া আর হাত পা ধোয়া। এ কাজগুলোয় আজকাল তিনি এক ধরনের আনন্দ পান—বাইরে থেকে ঘরে প্রবেশ করবার সময় মনে মনে সানন্দ প্রত্যাশায় থাকেন—এখন হাত পা ধোব। আজি তিনি কখন হাত পা ধুলেন নিজেই খেয়াল করলেন না। খেয়াল হল হাত পা ধুয়ে ঘরে ঢুকবার সময়। হাত পা ধুয়ে ফেলবার সময় হাত পা ধুয়ে ফেলবার আনন্দকে ভুলে ছিলেন। এ কথা মনে করে তিনি বঞ্চনার বেদনা অনুভব করেন। বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারে ভোরের সূর্যের মুখোমুখী হলেন। আজ আর পত্রিকার দিকে মন দিতে পারলেন না।

আর মাত্র দু'দিন পরে বিনয়বাবুর বয়স হবে আটাত্তর। না, বয়েস হবার জন্যে তিনি কাতর নন। প্রতিটি দিন যখন এক এক করে পেরিয়ে যেতে হয় তখন বয়েস

চোখে লাগে না। বয়েস অপ্রত্যাশিত ভাবে বিনা নোটিশে আসে না। একদিনে একমাত্র নাবালকেরই একদিনের বেশী বয়েস বাড়তে পারে— বয়স্কের বাড়ে না। উন্নত দেহ, লাল টকটকে ফরসা গড়ন— লম্বা লম্বা চোখ— টিকালো নাক— অতিস্বচ্ছ ও নরম চামড়া আর মোটা মোটা শক্ত হাড়ে তৈরী মজবুত দেহ— সাদা কুঞ্চিত কেশ— মাঝখান দিয়ে সিঁথি। বার্ধক্যের এমন সৌন্দর্য মনকে শ্রদ্ধায় আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বল্পবাক ও নরম মৃদুভাষী বিনয়বাবু নিজের মনে একা থাকতেই যেন ভালবাসেন। তাই বয়সের জন্যে তিনি ব্যথিত নন। জন্মদিনে তিনি বেঁচে থাকবার লজ্জা বোধ করেন।

ইদানীং জন্মদিনগুলোকে তিনি বড় ভয় করতে শুরু করেছেন। প্রতিটি জন্মদিন ক্রমেই মৃত্যুদিনের কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছে বলে তাঁর মনে কোন বিষাদযোগ নেই। প্রতিটি জন্মদিনে তিনি যে বেঁচে আছেন এই কথাটি লোকের মনে পড়ে যায় বলে বিনয়বাবু জন্মদিনে সঙ্কুচিত হয়ে যান। প্রতিটি জন্মদিনে তিনি অপরের মনে পড়ে যান বলে বেঁচে থাকবার কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত হন। সবাই জানল, বিনয়বাবু এখনও বেঁচে; জন্মদিনে বাঁচবার লজ্জায় তিনি আড়ষ্ট হয়ে থাকেন।

আজই হয়ত শর্মিলা এসে জানাবে, দাদু, আজ তোমার এবার জন্মদিনে ঠিক করেছি ওর ক'জন কোলিগকে সস্ত্রীক আসতে বলব, ও বলছে আমার বাবা মা কে বলতে, মেঝদাদু, দিদিমারা তো আসছেনই— ওর মামাদেরও তো বলতে হয়। কেকের অর্ডার আজই দিয়ে দিতে হবে।

শর্মিলা এসে বলবেই। নিশ্চয়ই। কোনদিন ভুল হয় না। সুকুমার-শর্মিলা, নাতি, নাতবৌ অল্প বয়সের ছেলে মেয়ে। পালা-পার্বণে নিখুঁত কাজ করে। আজও শর্মিলার ভুল হবে না। আরেকবার লোকে জানবে, বিনয়বাবু এখনও বেঁচে আছেন। বিনয়বাবুর বেঁচে থাকাটি আরেকবার জানাজানি হয়ে যাবে। আবার সেই নির্লজ্জ জন্মদিন এসে বিনয়বাবুর বেঁচে থাকাটিকে ফাঁস করে দেবে।

কোন আত্মীয় স্বজনের সংগে যোগাযোগ রাখেন না। তাঁর কালের লোক ক'জনই বা আছে। তাঁর সমসাময়িক লোক যে আস্তে আস্তে কেমন করে বিদায় নিয়ে গেছেন— তাঁদের অভাব তিনি বোধ করেন না। চিঠিপত্র লেখবার অভ্যাস প্রায় কোন কালেই ছিল না। যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছেন বহুকাল। একা একা নিজের ঘরেই সারা বছর কেটে যায়। বাড়িতে কেউ এলে, কোন আত্মীয় এলে, বিনয়বাবু কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করতে না আসেন। যদিও দেখা করবার, দু'চারটি কথা বলবার জন্যে, কিছু সংবাদ জানবার জন্যে একটা ক্ষিধে বোধ করেন। এই ক্ষিধে তিনি অগ্রাহ্য করেন— অসাধু চিন্তার মত নিষিদ্ধ করে দেন। দেখা করতে এলে ভারী সংকোচ বোধ করেন। নিজেকে তখনও এত অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যক মনে হয়— নিজেকে অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যক মনে করবার জন্য জগত জীবনের ওপর এত অভিমান হয়— মনের ভার কাটতে সময় লাগে। আবার দেখা না করে চলে গেলে, চলে যাবার সংবাদে নিশ্চিন্ত হবার বদলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক চিরে বের

হয়। চলে যাবার সংবাদে নিশ্চিন্ত হবার অনুভূতিকে ছাপিয়ে বিষণ্নতা মনকে আচ্ছন্ন করে। বৃদ্ধ বলে অবহেলা করে দেখাও করল না— এই বেদনা তিনি অনুভব করেন। অনুভব করেন দেখা হবার ঝামেলা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে। নিষ্কৃতি পাবার শান্তির সংগে মিশিয়ে অবহেলার দুঃখ, দেখা না হবার বেদনা রয়ে সয়ে আস্বাদন করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা না হবার জন্যে আরামবোধও করেন। যেন একটা ফাঁড়া কেটে গেল। তিনি যে বেঁচে আছেন— এই কথাটি অন্ততঃ গোপন করা গেল। সারা বছর ধরে তিনি যে বেঁচে আছেন এই কথাটি প্রাণপণে গোপন করে থাকেন। কিন্তু জন্মদিনে তিনি ধরা পড়ে যান।

পত্রিকা হাতে নিয়ে বসে থাকা যায় না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পত্রিকার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হবেই। পত্রিকা খুলে আজকাল তিনি প্রথমেই 'শোক সংবাদ' খুঁজে বেড়ান। শোক সংবাদটি আগাগোড়া মনোযোগ দিয়ে পড়েন। হিসেব করেন, যে ব্যক্তিটির মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হয়েছে, কত বছরে তিনি পরলোক গমন করলেন। যদি দেখেন পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর,— তবে সেদিন পত্রিকার অন্যান্য সংবাদগুলো একটা কটু স্বাদে তেতো হয়ে যায। বিস্বাদে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অন্যান্য সংবাদগুলো তাঁর মনোযোগকে বার বার প্রত্যাখান করত। তাঁর চেয়ে কম বয়সে মরে এই সব মৃতব্যক্তিরা যেন সেদিন সারা সকাল বিনয়বাবুকে লজ্জা দিতে থাকেন। নিজের অন্যায্যভাবে বেঁচে থাকবার অপরাধবোধ প্রায় স্নান পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী হত। যদি দেখতেন পরলোকগত ব্যক্তিটির বযেস আশী বছর পার হয়ে গিয়েছিল, তবে তিনি স্বস্তিতে ও শান্তিতে অনেকক্ষণ পত্রিকা হাতে চুপ করে থাকতেন। শান্ত অনুভূতিতে নিজের উদ্বিগ্ন-কাতর মনকে জুড়াতে দিতেন। নিজের বেঁচে থাকবার একটা যুক্তি যেন খুঁজে পেলেন। নিজেকে আর একা মনে হয় না। ইচ্ছে হয় সংবাদটি সুকুমার ও শর্মিলাকে পড়ে শোনান। ওর চেয়েও বেশী বয়সী লোক বেঁচে আছে, অন্ততঃ গতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল— একথা জানাতে পারলে যেন নিজের বেঁচে থাকার অধিকারটি বোধ করা যায। বিধান রায়ের মৃত্যু সংবাদে খুশী হয়ে শতমুখে বিধান রায়ের প্রশংসা করতেন— অথচ চিরকাল নেহেরুর প্রশংসা করে এসে নেহেরুর মৃত্যুর পর তিনি নেহরু সম্পর্কে নীরব হয়ে যান। নেহেরুর প্রশংসা উঠলেই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতেন। আশি বছরের আগে মরবার জন্যে নেহেরুকে তিনি ক্ষমা করতে পারেননি।

এ বাড়িতে সকালে কেউ ওঠে না। তাই এই সময়টুকু তিনি নিশ্চিন্ত। এই সময়টুকু— সাড়ে চারটা থেকে সাড়ে ছ'টার কাছে— বিনয়বাবু কৃতজ্ঞ। এ সময়টুকু তাকে কোন গ্লানি দেয়নি। কিন্তু উদ্বেগে ও দুশ্চিন্তায় এই সময়টুকুও বুঝি আজ পর হতে চলল। ভোর বেলাকার এই নিরিবিলি ও একান্ত আপন সময়টুকুকে উদ্বিগ্ন হতে দেখে বিনয়বাবু আর একজন নিজের লোকের বিয়োগবেদনা যেন অনুভব করেন।

পত্রিকা তুলে ধরেন। না, এসময়টুকুর নিশ্চিন্ত নির্দোষ মুখশ্রীতে চিন্তার কুটিল রেখা প্রকাশ হতে দেবেন না। ভোরবেলাকার এই স্নিগ্ধ বাতাসকে বৃথা প্রৌঢ় হতে

দেবেন না। পত্রিকার আড়ালেই দুশ্চিন্তার হাত থেকে আত্মগোপন। দুঃসংবাদের আড়ালে দুশ্চিন্তার সাময়িক নির্বাসন।

কোন শোকসংবাদ নেই আজ। এই শোকসংবাদটি পড়বার আগে বড্ড উদ্বেগবোধ করেন। তাঁর চেয়ে কমবয়সী, না, বেশী বয়সী? আটাত্তরের কম? না, আশীর বেশী? এ জন্যে রীতিমত দুশ্চিন্তা, রীতিমত উত্তেজনা। কোন শোক সংবাদ না থাকায় বিনয়বাবু আজ নিশ্চিন্ত হন। উদ্বেগ ও উত্তেজনার পর এবার একটু বিশ্রাম করেন। কিন্তু কোন শোক সংবাদ না থাকায় বিশ্রামটি কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে, কেমন মনে হয় আজ কোন সংবাদই নেই, কেমন স্বাদহীন মনে হয় নিজেকে। মনে হয়, দিনটি যেন আজ আলুনি হবে।

জন্মদিনে সবাই আসে। সুকুমার শর্মিলার বন্ধু-বান্ধব আসেন—আসেন আত্মীয়-স্বজনরাও। হৈ চৈ করবে, গান বাজনা করবে, প্রার্থনা করবে—অন্তরে অন্তরে কাঠ হয়ে বিনয়বাবু স্মিতমুখে বসে থাকেন। তিনি যে এখনও বেঁচে আছেন—এ যে আত্মীয় স্বজনদের কত ভাগ্য তা বার বার শুনতে হবে। বিরাট বট গাছের তলায় আত্মীয় স্বজনরা রয়েছেন— প্রত্যেকবারই ঠিক এই বিশেষণটি তাকে শুনতে হয়। সকলেরই পুরানো দিনের কথা শুনবার এত আকাঙ্ক্ষা হয়— ইচ্ছে হয় দু'দণ্ড বিনয়বাবুর পায়ের কাছে বসেন—কিন্তু কাজকর্ম সংসারের ঝামেলার জন্যে সাধ থাকলেও সাধ্য হয় না। এসব আত্মীয় স্বজনদের আশা আকাঙ্ক্ষা বিনয়বাবুর মুখস্ত। আশেপাশে পুরানো কেউ নেই। সে যুগের তিনি একক প্রতিনিধি। তাঁর কালের কেউ জন্মদিনে থাকে না। এই নতুন, প্রবীন ও তরুণদের মধ্যে নিজেকে অনধিকারী মনে হয়। মনে হয়, এখানে যাঁর প্রবেশ অনধিকার চর্চা। আত্মীয় স্বজনদের চোখে মুখে তিনি শ্রদ্ধা ভালবাসা দেখতে পান না—তাদের চোখে যেন পুরানো কালের কিছু দেখবার কৌতূহল— পুরাতত্ত্বের কৌতূহল। মনে হয় আত্মীয় স্বজনরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে উৎসবের মধ্য দিয়ে বিনয়বাবুর বেঁচে থাকবার জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করে যায়। তিনি এখনও বেঁচে আছেন দেখে সকলের অবাক হওয়াটি বড় লাগে। বিস্ময় ব্যথিত করে। আত্মীয়দের উৎসব-হৈ চৈ সব কিছুর মধ্য দিয়ে বিনয়বাবু যেন বেঁচে থাকবার জন্যে ওদের স্পষ্ট অনুযোগ শুনতে পান। আত্মীয়দের বিস্ময় যেন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুযোগে পরিণত হয়। সকলের পরমায়ু নিয়ে এতদিন বেঁচে থাকবার জন্যে নিজেকে যেন প্রার্থনা সভায় ভগবানের কাছে অভিযুক্ত মনে হয়। আত্মীয়রা যেন প্রার্থনার অছিলায় বিনয়বাবুর বিরুদ্ধে এতদিন বাঁচবার জন্যে অভিযোগ করেন। কমবয়সী আত্মীয়স্বজনের সামনে এতদিন বেঁচে থাকবার অপরাধে বিনয়বাবু যেন আসামী হয়ে বছরে একদিন তাদের সামনে হাজির হন।

কেউ কেউ বলেন, দাদু এমন কিছু বয়েস আপনার হয়নি। আমার ঠাকুর্দার চুরাশি হল। এখনও বেশ এ্যাকটিভ। নিজে রোজ বাজারে যান। সকাল বিকাল হাটেন।

এখনও ইংরেজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলেন, চার পয়সায় নাকি পাঁচটা ইলিশ মাছ পাওয়া যেত।

বিনয়বাবু সাগ্রহে শোনেন। সবাই শুনেছে কিনা দেখতে চান। একটু পরেই তাঁর মনে হয়, এ হচ্ছে জন্মদিনের উপহার। জন্মদিনে খেয়ে শুয়ে খুশী হয়ে যাবার সময় বিনয়বাবুর বেঁচে থাকার একটু সাফাই গেয়ে একটা সান্ত্বনা উপহার দিয়ে গেল। বিনয়বাবুর বেঁচে থাকাটা বড্ড চোখে লাগছিল বলে একটু সাফাই গেয়ে গেল। এত বেশি বয়সে জন্মদিনে নিজের বেঁচে থাকাটি বিনয়বাবুর বড্ড দৃষ্টিকটু লাগে।

কারো কারো মুখে অর্ধোচ্চারিত প্রশংসা ও বিস্ময়, উঃ এখনও কি রঙ, কেমন স্ট্রেইট ও স্টেডি— মেমোরী কি সার্প। আশে পাশের অনেকেই সায় দেন। কোন মেয়ে নিজের হতভাগ্য ক্ষুদ্রবেনীর কথা স্মরণ করে জানায়, এই বয়সে কেমন থাক থাক চুল— আর আমাদের তো এখনই এই টিকি। এসব কথায় তিনি যে একটু একটু খুশি হতেন না তা নয়। এখনও জীবনের সব লক্ষ্মণ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি— এ সংবাদ ও এর স্বীকৃতি তাঁর ভালই লাগে। জীবন এখনও তাকে ত্যাগ করেনি— রঙ, মেরুদণ্ড ও মেমোরী এখনও অটুট থেকে তাকে জীবনের দলভুক্ত করেই রেখেছে— রঙের ভেতর, মেরুদণ্ডের ভেতর, মেমোরীর ভেতর মৃত্যু এসে ঘুষ দিতে আরম্ভ করেনি— ব্যাধি এসে মৃত্যুর ভূমিকা শুরু করে দেয়নি। এ তথ্য জন্মদিনে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়। এ খবর ভালই লাগে। তবু, একটু পরেই, বিনয়বাবুর মনে হয় ওদের বিস্ময় হচ্ছে, তিরস্কার— ছদ্মবেশী ক্ষোভ। এই বয়সে ফরসা টকটকে রঙ রেখে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে স্মৃতিশক্তি জীবন্ত রেখে তিনি যেন অযথা জীবন থেকে দাক্ষিণ্য পাচ্ছেন। এ বয়সে যেন এসব থাকা ঠিক নয়। এ বয়সে এ সব মানায় না। ওদের বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে বিনয়বাবু যেন অবৈধ সম্পদ রাখবার অপরাধ বোধ করেন। বার্ধক্যে যৌবনের কিছু সম্পদ আত্মসাৎ করবার সঙ্কোচে ও অপরাধে তিনি আর লজ্জায় মুখ তুলতে পারেন না।

যাই বলুক— বয়েস হয়েছে। হ্যাঁ, বয়েস হয়েছে। নইলে এত ভয় করে কেন? আজকাল জন্মদিনের মুখোমুখি হতে এত ভয় কেন? আগেও সংকোচ ছিল, অপরাধ বোধ ছিল, অনিচ্ছাও ছিল— কিন্তু জন্মদিনের মুখোমুখি হবার সাহসও ছিল। আজকাল সংকোচ আড়ষ্টতায় পরিণত হয়েছে, অপরাধবোধ আত্মগ্লানি হিসেবে দেখা দিয়েছে, অনিচ্ছা আন্তরিক ভয়ে ভীরুতায় পর্যবসিত। আজ আর আগের মত সাহস নেই, বয়েস হয়েছে। টকটকে রঙ আজও রয়ে গেছে তাঁকে লজ্জা দেবার জন্যে। তাঁর বে-আইনী বেঁচে থাকাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে। সোজা মেরুদণ্ড অনধিকারীর সঙ্কোচ দেবার জন্যেই সোজা আছে— স্মৃতি তাঁকে প্রতি মুহূর্তে চুরি করে বেঁচে থাকবার পীড়নে পীড়িত করে। নির্বান্ধব, নিঃস্ব, একা— স্মৃতি সেই সংবাদই দেয়।

পেছনে কি লম্বা অতীত। আস্তে আস্তে তাঁর জীবনকে চারদিক দিয়ে স্মৃতি প্রায়

ঢেকে ফেলেছে—একটু খানি মাত্র তিনি জীবিত—বাকিটা স্মৃতির লবণাক্ত সমুদ্র। সেই স্মৃতির বিরাট সমুদ্র বিনয়বাবুর অস্তিত্বের ছোট দ্বীপটি যেন প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। অথচ সারাদিন পত্রিকা পড়েন, বই্ পড়েন, কারো কারো সঙ্গে অতীতের কিছু গল্প করেন—তাও অধিকাংশ কর্মজীবনের। এমনি করেই্ দিন কাটান। নিঃশব্দে বেঁচে থাকাটা নিতান্ত যেন গৌন ব্যাপার, এমনি ধারণা নিজেকে ও অপরকে দিতে চান। অতীত যে তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরে সব সময়, তাও নয়। স্মৃতি যে চাপা আগুনে তাকে দগ্ধ করে, এমনও নয়। স্মৃতি যে জোর করে অনুপ্রবেশ করে সময়ে সময়ে, তাও নয়। তিনি স্মৃতির ভৃত্য নন, শিকারও নন। অতীতকে স্মরণ না করলে অতীত অভদ্রের মত এখনও বিনানুমতিতে চেতনায প্রবেশ করে না।

গল্প করেন অধিকাংশই কর্ম জীবনের। কর্মজীবনের কথাই মনে করতে ভালোলাগে। তাতে অবশ্য কারো আগ্রহ্-ই তিনি দেখতে পান না। কিন্তু আগ্রহ্ না থাকলে কোন কিছু কাউকে জোর করে শোনাতে তিনি চান না—পারেনও না। একটু বলতে শুরু করেই তখন বোঝেন শ্রোতা নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে শুনছে তখনই তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন। গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। অন্যায্যভাবে বেঁচে থাকবার প্রমাণ বলে অনাগ্রহকে গ্রহণ করেন। বলতে যাবার জন্যে নিজের ওপর অসন্তুষ্ট হন। অপরের ওপর অভিমানের চেয়ে নিজের ওপর রাগই তাঁর বেশী হয়। নিজের ঘর, বারান্দা, পার্ক—এই হচ্ছে তাঁর নিজের জায়গা—বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক পত্রিকার মারফত—ঘর, বারান্দা, পার্ক ও পত্রিকার বাইরের জগত ঝাপসা, আবছা, সেখানে আর তিনি নিজেকে নিরাপদ মনে করেন না। পৃথিবী যেন ঠেলতে ঠেলতে তাকে এই্ পার্ক, পত্রিকা, ঘর ও বারান্দার মধ্যে কোনঠাসা করে ফেলেছে। এর বাইরে একটু এগুতে গেলেই পৃথিবীর সঙ্গেই ধাক্কা খাবেন।

মাঝে মধ্যে শর্মিলা এসে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। একটা সোয়েটার বুনতে বুনতে নানা প্রশ্ন। কখনো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন কথা জিজ্ঞেস করবে। নৈর্ব্যক্তিক কোন আকাঙ্ক্ষা নেই—কোন জিজ্ঞাসা নেই। শুধু ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আর বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কি-ই-বা বয়েস শর্মিলার—হয়ত পঁচিশও হয়নি—ওর স্বামীর চেয়ে অনেক পাকা—অনেক গুছিয়ে কথা বলতে জানে। দুপুরে কুরুশ কাটা আর উল হাতে নিয়ে আসতে দেখলে বিনয়বাবু রীতিমত বিপন্ন বোধ করেন। অধিকাংশ জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও প্রশ্ন তিনজন সম্পর্কে—বিনয়বাবুর স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে। এদের প্রসঙ্গ আসবার আগে তিনি বার বার অন্য বিষয়ে, অন্য প্রসঙ্গে যেতে চান। নিজে থেকেই হয়ত অন্য কোন ঘটনা বলতে শুরু করে সময়টা পার করে দিতে চান—কিন্তু ঘুরে ফিরে যে কোন ছুতোয় শর্মিলা ঐ প্রসঙ্গ তুলবেই। গল্পের মধ্যে একটু দম নিতে যেই তিনি থামেন অমনি সম্পূর্ণ অবান্তর হয় জেনেও শর্মিলা হয়ত তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করে বসে। অভিমানে ও ক্ষোভে তিনি আর গল্প না বলে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে যান। বিরক্ত হয়েছেন এ ভাবটি গোপন রাখতে

চান—সব সময় গোপন থাকে না—শর্মিলা তা বুঝতেও পারে তবু না বুঝবার ভান করে কিংবা হয়ত বিরক্তির কোন গুরুত্ব দেয় না—হয়ত ভেবেছে, বৃদ্ধের রাগের আর মূল্য কি? শর্মিলা বিদায় নিলে তিনি ঠিক হাফ ছেড়ে বাঁচেন তাও না। শার্মিলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একই সংগে আত্মগ্লানি ও অপরাধ বোধ তাকে কেমন অস্থির করে ফেলে। তারপর কেমন একটা আচ্ছন্নতার অস্পষ্টতায় ব্যাকুলতা বোধ করেন। মনে হয়, (স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূর মৃত্যুর পর নিজের এই বেঁচে থাকাটি এই সময়ে যেন বড় উগ্র হয়ে চোখে লাগে।) শর্মিলা যখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ তোলে তখন নিজের বেঁচে থাকাটি যেন চোখে কণা পড়বার মত কড় কড় করে। নিজের বেঁচে থাকাটি বড্ড চোখে পড়ে তখন। আবার তিনি যে ওদের প্রসঙ্গ তুলতে দিতে চান না, ওদের কথাও গল্প করতে চান না এতে যেন নিজেকে ভারী অপরাধী লাগে। বার বার গ্লানির সঙ্গে মনে হয়, তিনি ছাড়া তো ওদের বিষয় এত করে কেউ জানে না—এদের কথা কিছু না বললে যেন এদের এতকালের বেঁচে থাকাকে তিনি চেপে যেতে চান, গোপন করতে চান, ওদের স্মৃতির ওপর তর্পণ না করে তিনি যেন ওদের পারলৌকিক কর্ম অসমাপ্ত রাখছেন। (একই সঙ্গে নিজেকে অন্যায্য ও বেমানান বেঁচে থাকবার অসামঞ্জস্যবোধ ও স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূর স্মৃতিকে পাশ কাটাবার গ্লানি ও অপরাধচেতনা তাকে ক্ষুব্ধ ও অস্থির করে তোলে।) শর্মিলা চলে যেতেই অস্থির হয়ে কিছুটা পায়চারী করেন। উত্তেজনা ও পায়চারীতে একটু পরেই ক্লান্ত হয়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়েন। ক্ষোভ কমে এলে নিজেকে সান্ত্বনা দেন—এসব প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ হচ্ছে শর্মিলার অলস কৌতূহল—হয়ত আমাকে সঙ্গ দেবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ প্রশ্নগুলো করেছে, নিছক আমাকে কিছু বকানো দরকার তাই হয়ত এসব প্রশ্ন করে। হয়ত ভেবেছে স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূর কথা বললে আমি খুশী হব। শর্মিলার হয়ত কৌতহল নেই, শুধু আমাকে সঙ্গ দেবার জন্যই এই কৌতূহলের ভান। তবু তিনি কুরুশ কাটা আর উল নিয়ে দুপুরে শর্মিলাকে দেখলে আতংকিত হন আর সেদিন যদি অল্প বয়সীর কোন মৃত্যু-সংবাদ পত্রিকার শোক সংবাদে দেখে থাকেন তবে সবমিলে যেন জন্মদিনের উৎসবের অত্যাচারের মত তা হয়ে ওঠে।

(যখন বড্ড অসহায় লাগে, একঘেয়ে লাগে, যখন মানুষের সঙ্গলাভের ভয়ে আতংকিত হয়ে থাকেন বা একটা মানুষের সান্নিধ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা মৃদু থেকে সোচ্চার হতে থাকে—তখন তিনি ঘরের ফটোগুলোর দিতে তাকান) আপন পরিচিত মানুষগুলো আজ ফটো হয়ে গেছেন। আগে আগে ফটোগুলো সম্পর্কে অভিমানের অন্ত ছিল না। (যে মানুষ মরে গেছে তাঁর জায়গায় তাঁর ফটো—এমন অপরিতৃপ্তি, এমন নিষ্ঠুর সান্ত্বনা এমন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো—সব মন যেন বঞ্চনার বেদনায় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠত।) তারপর আস্তে আস্তে ফটোগুলো সহ্য হয়ে গেছে, সঙ্গী হয়ে গেছে। দুর্বল ও বিচলিত হলে তিনি অবিচলিত ফটোগুলোর দিকে তাকান। এদের উদ্দেশ্য

করে কত কথা তিনি বলেন মনে মনে। সে সব তিনি ভুলে গেছেন। ভুলে গেছেন তিনি তার অটুট স্মৃতিশক্তি থাকা সত্ত্বেও। ভুলে গেছেন বলে দুঃখ নেই। এদের কাছে যে সব দুঃখ বেদনা তিনি নিবেদন করেছেন তা মনে থাকলে দুঃখ বেদনাকে ভুলে থাকা সম্ভব হত না। এদের কাছে নিবেদিত দুঃখ-বেদনাকে মনে রাখবার দায়িত্ব তিনি নেননি।

ঠিক মাথার দিকে বাবার ফটো— যৌবনের। বাবা বেঁচে ছিলেন পঞ্চাশ পর্যন্ত। পাশে ওর মা'র ফটো— তাও যৌবনেরই। মা'র মৃত্যু আটচল্লিশে। কিন্তু ঐ ফটো ছাড়া তার মা'র ফটো নেই। পুত্রের ফটো— পঁচিশের একটি— ত্রিশের গোটা কয়েক। সকলেরই যৌবনের ফটো। বিনয়বাবুরও ফটো গোটা তিনেক। একটা মাত্র তিনচার বছর আগের। গত তিন পুরুষে তিনিই একমাত্র বৃদ্ধ হয়েছেন। বুড়ো হয়েছেন— তাকেই একমাত্র এতগুলো জন্মদিনের উৎসবের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। বাবা-মা-ছেলে— বৌমা সকলেরই পূর্ণ যৌবনের ফটো। কেবল তারই একলা নিলর্জ্জ বার্ধক্যের ফটো। এতদিন বেঁচে থাকবার চিরকালের সাক্ষী হয়ে রইল ঐ নিজের বৃদ্ধ বয়সের তোলা ফটোগুলো। জোর করে সুকুমার-শর্মিলা তুলে তারপর এনলার্জ করে রেখেছে। হোক টকটকে রঙ, সোজা মেরুদণ্ড, সজীব স্মৃতি— তবু, নিজেকে এ ঘরের সকলের চেয়ে বৃদ্ধ লাগে। তিনিও তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবেন না— তবু তিনি যে একদা বুড়ো হয়েছিলেন একথা আর কিছুতেই চাপা থাকতে পারবে না। যে বংশের সবাই যৌবনের সীমান্ত শেষ করবার আগেই জীবন শেষ করেছেন সেই বংশে এতকাল বেঁচে তিনি যেন বংশে অযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছেন। আয়ু চুরির জন্যে নিজেকে বংশের কলঙ্ক মনে হয়। এই বংশ মৃত্যুকে যে নজরানা দিয়ে এসেছে, তিনি যেন মৃত্যুকে পাওনা থেকে ফাঁকি দিয়ে বংশের মর্যাদা নষ্ট করেছেন। মৃত্যুকে ঠকিয়ে বংশকে হেয় করেছেন।

কখনো কখনো নিজের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষদের ওপর ক্ষোভ হয়। জন্মদিনের দিনগুলো যখন নিরুপায়ের মত এগিয়ে আসতে থাকে— তখন পালাবার সকল পথ রুদ্ধ দেখে ভারী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কিছুক্ষণের জন্যে। অল্প বয়সেই যে যার মত স্বচ্ছন্দে সরে পড়ল। কেউ ওর দিকে তাকাল না। অল্প বয়সের রঙীন পৃথিবী দেখতে দেখতে পৃথিবীকে রঙিন জেনেই বিদায় নিল। আর তাঁর কাঁধের ওপর আয়ুর বোঝা, দায়িত্বের বোঝা, পৃথিবীকে শুষ্ক শীর্ণ বিবর্ণ দেখবার অপ্রিয় কাজ চাপিয়ে দিয়ে একে একে স্বার্থপরের মত যে যার চলে গেল। বাবা-মা-স্ত্রী-পুত্রবধূ সবাই যেন জন্মের আগে পরামর্শ করে এসেছিলেন অল্পদিন বাঁচবেন, তাঁকে একা রেখে চারদিক থেকে খসে খসে পড়ে যাবেন। নিজেকে মনে হয় জ্যোতিহীন নিভন্ত সূর্য— ওর চারদিক থেকে গ্রহ-উপগ্রহগুলো সব ছুটে পালিয়ে গেছে— স্তূপীকৃত বয়সের ভারে তিনি যেন কেন্দ্রে বসে গ্রহ-উপগ্রহের স্মৃতি চয়ন করে চলেছেন। সুকুমার যেন সুদূর আকাশের প্লুটো— নতুন আবিষ্কার— সৌরজগতে একটি মাত্র গ্রহই আছে— কিন্তু

সে অনেক দূরের— আকর্ষণ আছে, কাছে টেনে নেবার উপায় নেই। তবু সৌর-আকাশে আর কোন গ্রহ-উপগ্রহ না থাকাতে সুকুমারই স্পষ্ট, তাঁর আকর্ষণের একমাত্র লক্ষ্য।.... যে যার চলে গেল। বেঁচে থাকবার সমস্ত আনন্দটুকু ওদের ভাগ্যে ঘটল— তা যত অল্পদিনই ঘটুক— আর তাঁর ভাগ্যে জীবনের বেদনার ভাগ, দুঃখ, গ্লানি, শোক ও কষ্টের ভাগ, চাপিয়ে দিল সবাই। (আনন্দে জীবন কাটাবার বেলা ওরা, রঙিন পৃথিবী থেকে স্বচ্ছন্দে বিদায় নেবার বেলা ওরা— আর নিরানন্দে, শোকে, বেদনায় দীর্ঘ জীবন কাটাবার বেলায় তিনি।) জীবনের সুখ ও আনন্দটুকু নেবার বেলায় ওরা— নিরানন্দের বোঝা দীর্ঘকাল বইবার জন্যে তিনি। বিশ্ববিধানের এই অন্যায্য ও নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্যের জন্যে তাঁর কোন নালিশ নেই, অভিযোগ নেই— শুধু আছে বেদনা ও দীর্ঘনিঃশ্বাস। নিয়তির পক্ষপাতিত্বের জন্যে, ঈশ্বরের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে তিনি চেষ্টা করেও অন্তর থেকে প্রতিবাদ করতে পারেন নি।

কিন্তু এই অভিমান স্বল্পায়ু। বরং তাঁরই মত দীর্ঘায়ু হচ্ছে সেই অপরাধবোধ— যে অপরাধবোধ তাকে উত্যক্ত করে, বাবা, মা, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ— এদের সকলকে বঞ্চনা করে এতদিন বেঁচে থাকবার লজ্জা। সকলেই যৌবনে মরে গেল— তিনি যেন এদের চোখে ধুলো দিয়ে এখনও বেঁচে রয়েছেন। ফটোগুলোর সামনে আটাত্তর বছর বয়েস নিয়ে অহর্নিশি বেঁচে থাকতে কত লজ্জা করে, কী ভীষণ সঙ্কোচ লাগে, শর্মিলা-সুকুমারকে কোনদিন তা বোঝান যাবে? আর বললেও কি ওরা তা বুঝবে? স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ সম্পর্কে বিনয়বাবুর অস্বাভাবিকরকম শীতল সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে শর্মিলা হয়ত ভাবে, এদের সম্পর্কে তাঁর শোক এখনও জরাজীর্ণ হয়ে যায়নি— প্রসঙ্গ উঠলেই কষ্ট পান। তাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই শর্মিলা লজ্জা পায়, উত্তর পেয়ে কিছুটা অপ্রস্তুতও বোধ করে। অথচ কৌতূহলও দমন করতে পারে না— বার বার জিজ্ঞেস করে, জিজ্ঞেস করে লজ্জা পায়— উত্তর পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে যায়..... তবুও আবার...। বিনয়বাবু সবই বোঝেন। তবু স্বস্তি কই?

সেদিন এক পুরানো সহকর্মীর ছেলে এসেছিল, পিতার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে। সহকর্মী বয়সে ওর চেয়ে দশ বারো বছরের ছোট ছিলেন। চাকুরীতে বহাল করা থেকে বহুবার চাকুরী রক্ষা করতে তিনি সাহায্য করেছিলেন। ভারী রগচটা মানুষ ছিলেন। উপরওয়ালা সাহেবদের ওপর একটা জাতক্রোধ ছিল। তাদের প্রত্যেক ব্যবহারের পেছনে কুমতলব, প্রতিটি প্রশংসার পেছনে শ্লেষ আবিষ্কার করতেন। ইংরেজদের সব খারাপ আর ভারতবর্ষের সব ভালো, এই-ই ছিল তাঁর প্রাণের কথা। দেশ স্বাধীন হবার পরও এই বিশ্বাস তাঁর টলেনি। কনিষ্ঠ সহকর্মী বহুদিন মনে পড়েনি। মৃত্যুর সংবাদে আবার মনে পড়ল। ছেলেরা সব যোগ্য হয়েছে। সবাই বেঁচেবর্তে আছে। ছোট ছেলেটি এসেছিল শ্রাদ্ধের নেমতন্ন করতে। ওর বাবার মরবার বয়েস যে মোটেই হয়নি সেই কথাই বার বার বলছিল। বিনয়বাবু ভাবলেন, আমাকে দেখেই হয়ত ছেলেটির মনে পড়েছে, বাবার মরবার বয়েস এখনও হয়নি। বাবার চেয়েও

জ্যেষ্ঠ সহকর্মীকে বেঁচে থাকতে দেখে হয়ত ওর এখন মনে হচ্ছে, বাবার আরও কিছুদিন বাঁচবার অধিকার ছিল। হয়ত এ'কদিন সকলের কাছে সান্ত্বনা পেয়েছে, বাবা যোগ্য বয়সে গেছেন। এখন যেন নিজের শোক করবার একটা যুক্তি পেল— ক্ষেত্র পেল। মনে হয় তাতে যেন ছেলেটি ক্ষুণ্ণই হল। শেষ পর্যন্ত ছেলেটি যেন কেমন অসন্তুষ্ট হয়েই চলে যায় তাকে বেঁচে থাকতে দেখে। নিয়তি বৃদ্ধ বিনয়বাবুকে বাঁচিয়ে রেখে প্রৌঢ় পিতাকে মেরে ফেলবার জন্য ছেলে বাবার জন্যে নতুন করে দুঃখিত হয়। বিনয়বাবুর মনে হয় নিয়তির কাছ থেকে এই পক্ষপাতিত্ব আদায় করবার জন্যে যেন ছেলেটি কিছুতেই তাকে ক্ষমা করতে পারছিল না। সারাক্ষণ অসন্তুষ্ট মুখে কথা বলে, শেষে জানিয়ে যায়— আমরা কেউ আপনাদের মত আয়ু পাব না। নিজেদের নাম করে বাবার চেয়েও বেশী বাঁচবার জন্যে যেন অনুযোগ করে গেল। কনিষ্ঠ সহকর্মীর মৃত্যুতে বিনয়বাবু দুঃখিত ঠিক হলেন না— লজ্জিত হলেন। ছেলেটির সামনে নিজেকে জীবিত দেখতে লজ্জা।

যে মরে যায় তাকে অনেকক্ষণ ধরে মনে পড়ে। বেশ ক'দিন চেতনার কেন্দ্রস্থানে তিনি থাকেন— চিরকালের মত বিদায় নেবার পর ক'দিন অভ্যাস বসে আত্মীয় বন্ধুদের কাছে মানসিকভাবে বেঁচে থাকেন। আগে আগে কোথাও যেতে হলে শুভসময়ে ঘর থেকে যাত্রা করে বৈঠকখানায় রাত কাটাতে হয়েছে। মৃতলোকের স্মৃতিও তেমনি নিজের জীবন থেকে মহাযাত্রা করে আত্মীয়বন্ধুদের মনের বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ থাকে। সেদিন কিন্তু পুরানো সহকর্মীকে বেশিক্ষণ মনে পড়ল না। ছেলেটি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ নিজের বেঁচে থাকার অমার্জনীয় অপরাধে মুষড়ে রইলেন। নিজেকে তিরস্কৃত মনে হয় বহুক্ষণ পর্যন্ত।

স্ত্রী মরে যাবার পর কি অনেকক্ষণ ধরে মনে পড়েছিল। কতকাল আগের কথা— ঠিক মনে পড়তে চায় না। পুরবালার চলা বলা হাসি কান্নার নানা স্মৃতির চেয়ে এখন ওর কথা মনে এলেই দেওয়ালে টানানো ফ্রেমে আটা ছবিটিই মনে আসে আপনা আপনি। তারপরেও যদি স্ত্রীর আচার ব্যবহার আরো মনে করতে চান— তখন স্মৃতির কক্ষে কক্ষে জোর অনুসন্ধান করতে হয়— ঝাপসা ঝাপসা মনে আসে....। বরং অন্য প্রসঙ্গ ভাবতে ভাবতে কখনও হঠাৎ স্ত্রী'র একটুকরো ব্যবহার ....হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মনে পড়ে। আবার জোর করে স্ত্রী'র কথা ভাবতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক মনে সচল ঝাপসা স্মৃতিগুলো মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে হারিয়ে যায়। অতদূর অতীত থেকে স্মৃতিগুলো আসতে চায় না। চারদিকের আধুনিক পরিবেশে সেকেলে স্ত্রীর স্মৃতি যেন বড্ড সঙ্কুচিত, বিব্রত। সকলের স্ত্রী পুরানো হয়, বিনয়বাবুর স্ত্রী যেন আস্তে আস্তে অপরিচিত হয়ে গেলেন। তারপর মৃত্যু তাকে সম্ভ্রম এনে দিয়েছে, দূরত্ব এনে দিয়েছে, তাকে এক বয়সের করে রেখেছে। সময় তাকে যেন প্রবাসী করে দিয়েছে। এই পক্ককেশ আটাত্তর বছরের বৃদ্ধের কাছে প্রায় অপরিচিত, বহুদূরের তরুণী ভার্যার সম্ভ্রম স্মৃতি বড্ড বেমানান লাগে। স্ত্রীর যৌবনের ফটোর

পাশে নিজের বার্ধক্যের ফটো, নিজের বার্ধক্যের চেহাবার চেয়ে গ্লানি ও একাকীত্বের আর কি আছে? স্ত্রীর স্মৃতির চেয়ে স্ত্রী সম্পর্কে ভাবনার স্মৃতিগুলো যেন অনেক স্পষ্ট। স্ত্রী সম্পর্কে কি কি ভাবতেন সেই ভাবনাগুলোই অনেক স্পষ্ট ও উজ্জ্বল স্ত্রীর স্মৃতির চেয়ে।

আজকের কথা— প্রায় ষাট বছর হতে চলল তাদের বিয়ে হযেছিল। তখন পুরবালার বয়েস বারো— বিনয়বাবুর আঠারো। বেঁচে থাকলে বযস হত বাহাত্তর। কত জোর থাকত যদি নিকট বয়েসী স্ত্রী থাকত। নিজের বেঁচে থাকবার একটা বলিষ্ঠ সমর্থন ও সাহায্য পেতেন প্রবীনা ভার্য্যার কাছ থেকে।.... বিয়ে হয ইঞ্জিনিযারিং পডছিলেন যখন। তারপর ঠিক দশ বছরের মাথায় স্ত্রী মারা গেলেন। একটি মাত্র বাচ্চাকে রেখে। বিনযবাবু তখন পি.ডাবলু-ডি'র ইঞ্জিনিয়াব— কবাচিতে। পুরবালারা সব দেশেব বাড়িতে— হুগলীতে। একটা পোষ্টকার্ডে বাবা জানিয়েছিলেন ওর মৃত্যুর সংবাদ। পঞ্চাশ বছর আগে পেয়েছিলেন স্ত্রীব মৃত্যু সংবাদ— সেই পুবানো দিনেব এক পযসাব পোষ্টকার্ডে।

কতটুকুই বা পরিচয় হযেছিল ঐ দশ বছরে। ইঞ্জিনিযারিং পডবার সময় ছুটিতে যখন গ্রামের বাড়িতে আসতেন— সাবাদিনে তো দেখা করবার নিয়ম ছিল না... রাত দশটার পর দেখা হত। বিনযবাবু ইচ্ছে করে করে আরো দেরীতে শোবাব ঘরে যেতেন, দেখাতেন স্ত্রী সম্পর্কে তাঁর গরজ কত কম। নিজের প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও অতি অল্পই চিঠি দিযেছেন। তিনি স্ত্রৈণ নন, স্ত্রী-গত প্রাণ নয়— একথা বোঝাবার আকাঙ্ক্ষাই ছিল তখন বেশী। আটাত্তর বছব বযেস একদিন তাঁব হবে এমন আগাম সংবাদ কি তিনি সে সমযেই পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে ঘন ঘন চিঠি দেওযা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। অভিভাবকরা কি ভাববেন। তাই মাঝেমাঝে চিঠি লিখতে হত— সে সময়গুলো তখন কত কষ্ট করে কাটাতেন— স্ত্রীর হাতের লেখার জন্যে সমস্ত অন্তর কেমন তৃষ্ণার্ত হযে থাকত.... অথচ তবু সময় কেটে যেত....হু হু করেই কেটে যেত। স্ত্রী চিঠির উত্তর দিতেন— তাতে তিনি বিনযবাবুকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করে লিখতেন। অবশ্য সামনে 'তুমিই' বলতেন। তাঁব ইচ্ছে হত— 'আপনি' করে লিখতে মানা করে দেয। কিন্তু তিনি যে চিঠি দেবেন স্ত্রীকে তা তো বাডিব সব মেয়েরাই পড়বে— এ তিনি জানতেন। তাই চিঠিতে কিছু লেখা হযে উঠত না। সামনেও বলবেন বলবেন করে বলা হয়ে ওঠেনি।

স্ত্রীকে লেখা চিঠি বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও পডবে জেনে সেই ভাবেই তিনি চিঠি লিখতেন— আদর্শ বধূ ও আদর্শ পুত্রবধূ হবার উপদেশ দিয়ে সাধুভাষায চিঠি লিখতেন— যাতে বাড়ির অন্য মেয়েরা বুঝতে পারে তিনি কেমন শাস্ত্রসম্মত নিবাসক্ত আদর্শ স্বামী। বাবা মা গুরুজনরা পুত্রবধূর কাছে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করেন— তিনি স্ত্রীকে সেই ব্যবহারের উপযোগী হবার উপদেশ দিতেন। গুরুজন স্ত্রীর সংগে যেমন

ব্যবহার পছন্দ করে তিনি পুরোবালার সঙ্গে সামনেও সেইরকম ব্যবহারই করতেন— যদিও কতটুকুই বা ওর সঙ্গে দেখা হত— দিনে তো হতই না। যে রকম চিঠি লিখলে অপর মেয়েরা বুঝবে বিনয়বাবু স্ত্রৈণ নন—সেই রকম চিঠিই ছিল সবগুলো। অপরের দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর সংগে ব্যবহার করেছেন— অপর মেয়েদের কল্পনা করে স্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন—নিজের মন যা চায় সে রকম ব্যবহার করেননি— নিজে যা লিখতে চান— লেখেননি। যে যুগের যা হাওয়া। স্ত্রীরও এতে ক্ষোভ ছিল বলে মনে হয়নি কখনো। হয়ত তাঁর মত কি লিখেছেন তা বড় কথা নয়.... হাতের লেখাটুকুতেই স্পর্শ পাওয়া— এও পুরবালাও ভাবত।

তাছাড়া বিনয়বাবুর মনই বা কি চেয়েছিল, কেমন ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কেমন ব্যবহার পেতে চেয়েছিল, কে জানে? এখন আর স্পষ্ট করে কিছু মনে পড়ে না। তবে এটুকু মনে আছে স্বামী তখন স্ত্রীর বন্ধু ছিলেন না আজকের মত। স্বামী ছিলেন শ্বশুর শাশুড়ীর মতই একজন গুরুজন। আর স্বামীকে নিয়ে কৌতূহল স্ত্রীর পক্ষে চরম বেহায়াপনা আর স্ত্রী সম্পর্কে স্বামীর প্রকাশ্য মনোযোগ অতিশয় স্ত্রৈণতার লক্ষণ— পুরুষের লক্ষণ নয়। স্ত্রী বলে যে এখন আছে তখন এইটে স্বীকার করা ছিল ভারী লজ্জার ব্যাপার। সংবাদটি গোপন করাই তখন সামাজিক নিয়ম ছিল। গুরুজনরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু সেই কারণে স্ত্রীকে নিয়ে মাতামাতি সে যুগে তা ভাবা যাব না।

পুরবালার মৃত্যুসংবাদ পাবার পর বিনয়বাবু কি খুব শোকগ্রস্ত হয়েছিলেন? দিনরাত কি স্ত্রীকে ভাবতেন? বরং তিনি যে শোকগ্রস্ত হননি— নার্ভ যে খুব শক্ত — এ কথা প্রমাণ করাই কি সে সময় তাঁর প্রধান কাজ ছিল না?

তখন স্ত্রীর প্রসঙ্গ অপরের কাছে তোলা বিশেষতঃ গুরুজনদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল। বিনয়বাবুর যে স্ত্রী ছিলেন, তিনি যে অকালে মারা গেছেন এ সব কথা বলে স্ত্রীকে স্বীকৃতি দেওয়া বিশেষতঃ গুরুজনদের কাছে এক অকল্পনীয় ঘটনা। গুরুজনেরা এই সব তুচ্ছ ঘটনাকে আমল দেওয়া নিতান্ত বাহুল্য মনে করতেন। অনাত্মীয় ব্যক্তিদের কাছেও বিনয়বাবু পারতপক্ষে পুরবালা প্রসঙ্গ তুলতেন না — বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও বড় নয়। এ যেন একটা লজ্জাকর গোপনীয় ব্যাপার — তা ছাড়া বড় তুচ্ছ — একে অত আমল দিয়ে মূল্য দিতে নেই। নিজের হৃদয়কে অত মূল্য দিতে নেই, অত বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু হৃদয়ও কি খুব তোলপাড় করেছিল? কি জানি, মনে পড়ে না। এটুকু মনে আছে, শোকে বিচলিত হইনি, কাবু হইনি, ভেঙ্গে পড়িনি, কাতর হইনি, এ বাহাদুরীই ছিল প্রধান। ব্যথা অনুভব করবার চেয়ে ব্যথিত হইনি একথা নিঃশব্দে প্রচার করবার দিকেই ঝোঁক তখন প্রবল ছিল। কতটুকুই বা পুরবালাকে ভেবেছি, কতটুকুই বা ওর জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছি, ওর মৃত্যু সংবাদকে নার্ভের একটা পরীক্ষা হিসেবে নিয়েছিলাম তাতে উত্তীর্ণ হয়েছি। তাই বোধ হয় পুরবালার স্মৃতির চেয়ে পুরবালার ফটোই আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। স্ত্রীকে মনে এলে ফটোর স্মৃতিই মনে আসে।

পুরবালার মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর সারা সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। স্ত্রী-প্রসঙ্গে সবসময় ডুবে থাকতে চেষ্টা করতেন। তাতে এমনকি স্ত্রীর যে মৃত্যু হয়েছে একথাও মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন। হয়ত রাতে ঘরে ঢুকে মনে হত কতদিন স্ত্রীর চিঠি... ও, কি ভাবছি। ঠিক তক্ষুনি প্রয়োজন না থাকলেও ম্যাপ ও নকশা নিয়ে বসে পড়তেন। মাঝে মধ্যে আচমকা মনে হত, স্ত্রী মারা গিয়ে ওকে বিপত্নীক করে দিয়ে গেলেন। আজ আর তিনি কুমার নন—হয়ত হতে পারেন দোজবর। ভারী ঘৃণা ছিল ঐ 'দোজবর' শব্দটির ওপর। যখন মনে হত, স্ত্রী মরে গিয়ে তাকে দোজবরের দিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেলেন—তখন স্ত্রীর মৃত্যুকে ক্ষতিকর বলেই মনে হত। ছুটিতে নিয়মিত বাড়ি আসতেন। আসতে একটুও ইচ্ছে হত না। বাড়ি যে শুধু শূন্য মনে হত তাই নয়—কেমন একটা বিতৃষ্ণা গড়ে উঠেছিল বাড়ির ওপর। তবুও আসতেন। পাছে সকলে মনে করেন, স্ত্রীর আকর্ষণ চলে গেল বলেই বাড়ির দিকে মন টানছে না। তাই আসতেন—আসতে হত অথচ করাচি থেকে হুগলী পর্যন্ত সমস্ত পথটাই তখন এত বিতৃষ্ণা ও ক্লান্তিকর, এত শূন্যতা ও নিরানন্দময় ছিল তা কি কাউকে বোঝানো যেত। অথচ পুরবালা যখন বেঁচেছিল—সে সময় সারাক্ষণ মন রাতের অল্প মুহূর্তকটির প্রত্যাশায় থাকত। রাতের সেই সামান্য মুহূর্তকটিই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মোহনীয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন আসতেন—তখন তাঁর যে কিছুই ভাল লাগত না। একথা শুধু যে গোপন করতে হত তাই নয়—রাতের বেলা একা থাকবার জন্যে যখন মন ব্যাকুল হয়ে উঠত তখনও একা থাকবার উপায় ছিল না— তাঁর ঘরে এক ভাই-পো বা ভাগনেকে শুতে দেওয়া হত—কারণ গুরুজনের নির্দেশ-নির্দেশের কারণ যদি মৃত স্ত্রী এসে মধ্য রাতে আলাপ জমাতে চেষ্টা করে—ভাই-পো, ভাগনেকে দেখলে হয়ত লজ্জা পাবে। কখনও কখনও তাঁর কোন একজন কাকা, মামা জাতীয়ও কেউ না কেউ শুতেন—গুরুজন দেখে যদি স্ত্রী স্বামীর কাছে না আসে। তাকে দেখে গুরুজনরা মৃত্যুর বিবরণ বলেছে—তাতেই মনে হয়েছে, গুরুজনরা তাঁর স্ত্রীকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনিও কি তাতে কৃতার্থ ও সঙ্কুচিত হয়ে যাননি। তাঁর কি তখনও সসঙ্কোচে মনে হয়নি পুরবালা বড্ড বেশি মূল্য পাচ্ছে—পুরবালার প্রসঙ্গ শেষ করবার জন্যে তিনিই কি সলজ্জভাবে ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি? পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভেবেছিলেন—নিতান্ত মৃত্যুর মূল্যেই পুরবালা গুরুজনদের কাছে মূল্য পেল।

শুধু কি নিয়মভঙ্গ করতেই বাড়িতে আসতেন? শুধু পাছে লোকে কিছু বলে তাই নিতান্ত বিরক্ত ও নীরসভাবে করাচী থেকে হুগলীতে আসতেন। বাড়িতে এসেই বিয়ের তাগাদা শোনবার, কন্যাকর্তার তাগাদা শোনবার গোপন প্রলোভন কি করাচী থেকে হুগলী পর্যন্ত বাতাসের মত অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গী হত না? বাড়িতে কোন অপরিচিত লোককে দেখলেই কি তাঁর মন একটা গোপন অনুচ্চারিত সানন্দ প্রত্যাশায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকত না? আবার বিয়ে করবার জন্যও বার বার পীড়াপীড়ি শুনবার

আকর্ষণ কি তাঁর অনেকটা নেশার মত হয়ে যায়নি? তাগাদা ঘন ঘন না ঘটলে তাঁর ওপর যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না এমনি একটা অভিমান কি তাকে বাড়ি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা করে তুলত না? তখন কখনও কখনও কি নিজেকে প্রতিশ্রুতি দেননি — যা খুশি এঁরা ভাবুক — আগামীবার ছুটিতে আসছিনা। না এসে যদি টনক নড়ে...। অথচ বিয়ের প্রস্তাব পত্রপাঠ নাকচ করে দিয়েছেন — তবু তাগাদা শোনবার জন্যে অপেক্ষায় রয়েছেন। অনেক সময় বিদ্যুৎ ঝলকের মত মনে হয়েছে, বিয়ের তাগাদা আর শুনতে পাচ্ছেন না বলেই হয়ত তিনি আর বিয়ে করলেন না। নিজেকে লোভনীয় করে রাখবার ইচ্ছে কি তাঁর ছিল না? পারতপক্ষে গুরুজনদের বিয়ের প্রস্তাব তাঁব সামনে তিনি তুলতে দেননি — আঁচ পেয়েই স্থান ত্যাগ করেছেন। দু'চার বার হয়ত সামনেই বলেছেন — মাথা নিচু করে শুনে কোন মন্তব্য না করে স্থান ত্যাগ কবেছেন। অপরের কাছে নিষেধ কবে দিয়েছেন।

মোটেব ওপর গুরুজনদের তিনি বিয়ের প্রসঙ্গ বিশেষ তুলতে দেননি। তা কি শুধুই লজ্জায়? গুরুজনরা যদি ওর মৃত স্ত্রীব প্রসঙ্গ তুলে প্রশংসা বা দুঃখ করতে চেয়েছেন — তখন তিনি কিছুটা কৃতার্থবোধ কবলেও সেই কৃতার্থবোধকে আমল না দিয়ে স্ত্রীর প্রসঙ্গ ঠিক আগের মতই এড়িয়ে গেছেন — অশোভনভাবে অন্যপ্রসঙ্গ তুলেছেন নতুবা চলে এসেছেন জোর কবে। এ কি শুধু লজ্জায়? স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুললে তিনি বেশি অভিভূত হযে পড়বেন এই ভয়ে? মনে হয় অভিমানে। যে গুরুজনদের মুখেব দিকে তাকিয়ে পুরবালার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারেনি — যে গুরুজন পুববালা বেঁচে থাকতে কোন দিন তাঁব প্রসঙ্গ তুলে তাকে কোন মূল্য দেয়নি, আজ বিনয়বাবু সেই সব গুরুজনদের শোক করবার অধিকার দিতে চান না। গুরুজনরা তাঁব স্ত্রীকে মূল্য দিক — বিনয়বাবুব পক্ষে তা সহ্য করা শক্ত। আর পাঁচজন মৃত ব্যক্তির মত পুরবালাকে মামুলি শোকের অন্তর্ভুক্ত করা হোক তা তিনি চাননি। এ'তে যেন স্ত্রীকে শুধু তার পর মনে হয় তাই নয — পুরবালার এতকালের স্মৃতির মধ্যে নিজেকেও পরিচিত ও আপন মনে হয় না। পুরবালার মৃত্যুর আগের স্মৃতির মধ্যে নিজেকে ও পুরবালাকে নিয়ে তিনি বার বার ভাবতে চাননি সত্য, কিন্তু তাকে, সেই স্মৃতিকে, অনাত্মীয় দর্শকের মত নিরাসক্ত ভাবে দেখতেও চাননি। পুরবালার স্মৃতি ও পুরবালার সংগে সংশ্লিষ্ট নিজের স্মৃতি দুইকেই তিনি পর করেননি, অনাত্মীয় করেননি, অশ্রদ্ধা করেননি, একেবারে ভুলতেও চাননি — শুধু ভাবতে ভাল লাগত না। ভাবতে চাইতেনও না। তবু যা হোক তিনি আর বিয়ে করেননি। দিনের পর দিন গুরুজনদের নির্দেশ, মা'র অশ্রু, বন্ধুদের অনুরোধকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন। বিয়ের অনুরোধের জন্যে যেমন অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করেছেন — তেমনি বিয়ে যে করবেন না একথা বলবার জন্যেও অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করেছেন। যাই হোক, বিয়ে তিনি করেননি। গুরুজনদের নির্দেশে বিয়ে করতে হবে বলেই হয়ত তিনি বিয়ে করেননি — হয়ত বিয়ে না করে গুরুজনদের ওপর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে

চেয়েছিলেন— তাঁদের অমান্য করবার সুযোগ হয়ত নিয়েছিলেন বিয়ে না করে। হয়ত নিজেকে দোজবর মনে করে নিজেকে ভারী অরুচিকর মনে হয়েছিল — নবাগতার চোখে নিজেকে সস্তা মনে হবার একটা বিপদও বোধ করেছিলেন। হয়ত ছেলেটির কথাও মনে এসেছিল — ওকে সৎমার হাতে দিতে হয়ত অনিচ্ছাও ছিল। কিংবা বিয়ে না করেও তিনি থাকতে পারেন, হয়ত এই স্বাভাবিক স্পর্ধায় বিয়ে করেননি। বিয়ে করবার তাগাদা শোনবার মোহেও হয়ত বিয়ে করেননি। এসবগুলোর কোনও একটি কারণের জন্যে বা সবকটি কারণের মেলামেশার জন্যে বিয়ে করেননি — আজ তা ঠিক করা সম্ভবও নয়। অথচ এক এক সময় এক একটাকেই বিয়ে না করবার কারণ বলে মনে হয়েছে।

যতই বলুন, বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াতও কমে আসেনি। বিয়ে না করবার কথা যতই স্থির করছিলেন — ততই বাড়িতে আসবার গরজও কমে গিয়েছিল তাই নয়, বাড়িতে না আসবার জন্যে কোনও অপরাধবোধও হচ্ছিল না — বাড়ির লোকদের কাছে আসবার বাধ্যবাধকতাকেও অগ্রাহ্য করবার একটা স্বাভাবিক শক্তি অনুভব করছিলেন। বিয়ে না করবার কথা যতই মনে স্থির হয়ে বসেছে — যদিও তা স্থির হতে অনেক সময় লেগেছিল — ততই তিনি বাড়ি না গেলে কে কি ভাববে তা আর তাকে পীড়া দিত না। তাছাড়া ছুটি ছাটাও বড় পেতেন না। ক্রমেই কাজের মধ্যে নিঃশব্দে ডুবে যাচ্ছিলেন। কাজ করে আনন্দও পেতেন — আর সেই আনন্দকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইতেনও। তাঁর উচ্চপদস্থ সাহেব অফিসারও তাঁর নিষ্ঠার প্রশংসা করতেন — খুব নির্ভরও করতেন। কোনো কিছু কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। সাহেবদের একটা বিশ্বাস ছিল ভারতীয়রা মূলতঃ ফাঁকিবাজ, অলস ও বাচাল — কাজ যতটুকু করে — তা হয় উপরওয়ালাকে তোষামোদ করবার একটা রূপ, নয়ত ইনক্রিমেন্ট সামনে এলে, নয়ত-নিজেকে জাহির করবার জন্যে। কাজ ভালবেসে কেউ কাজ করে না। কিন্তু বিনয়বাবুর শান্ত স্বভাব, নীরব কর্তব্যপরায়ণতা, কাজের ওপর অনুরাগকে তাঁরা প্রশংসার চোখেই দেখতেন। তবে বিনয়বাবুর ব্যবহারে শীতলতা ও ইংরেজ-শাসনের সুফল সম্পর্কে কোনোও রকম উষ্ণতা না দেখে অনেকেই ক্ষুণ্ন হয়েছেন। কাজের অনুপাতে বিনয়বাবুর উন্নতি দ্রুত হয়নি — তবে হয়েছে, সে যুগে যতটা হওয়া সম্ভব ততটাই, আস্তে আস্তে। অধিকাংশ 'বস'ই তাঁর ওপর নির্ভর করতেন — কিন্তু খুব কমই তাঁর উন্নতির জন্যে চেষ্টা করেছেন। এজন্য সহকর্মীরা প্রকাশ্যে, অধঃস্তন কর্মীরা আড়ালে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতেন। কিন্তু তিনি যেন আঘাত পেতেন না। আস্তে আস্তে তাঁর স্বভাবের চারিদিকে কেমন একটা প্রাচীর গড়ে উঠছিল — যেখানে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। ফলে সেই নিঃশব্দ দুর্গে কোন আঘাতই গিয়ে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত না।

এরই মধ্যে কয়েক বছরের মাথায় বাবার মৃত্যু সংবাদ এল। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাড়িতে এসেছিলেন — কিন্তু কান্নাকাটি করেনি। ভাইরা তাঁকে দেখে চিৎকার করে

কেঁদেছে। বোনরা অপেক্ষা করে থাকত — কে কখন আসবে — সংগে সংগে কান্না শুরু করবে প্রবল ভাবে। বোনদের মধ্যে যেন কান্নার একটা প্রতিযোগিতাও চলত — কার কত শোক হয়েছে একথা বোঝাতে বোনদের যেন আর চোখের জল শেষ হতে চাইত না — এমন কথাও তাঁর মনে হয়েছে। (মা'র বিলাপ, বোনদের একটানা আর্তনাদ, ভাইদের সশব্দ কান্নার মধ্য দিয়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অভ্যর্থনা, সবই যেন ব্যর্থ হল। বিনয়বাবু কাঁদলেন না। এ'তে মা ক্ষুণ্ন, ভাইরা ক্ষুণ্ন, বোনেরা নিজের কান্না দিয়ে দাদাকে কাঁদাতে না পারায় আহত। তাঁর মধ্যে তপ্ত শোকের অভাব সকলেই অনুভব করলেন। বন্ধু ও সমবয়সী আত্মীয়রা বললেন — ওর স্বভাব চাপা — ভেতরে কাঁদে — বাইরে তা বোঝা যায় না। ওকে একটু কাঁদাতে পারলে ভালো হত। গুমরে গুমরে রয়েছে....।)

চাপা স্বভাব কিনা নিজের বিনয়বাবুর তা জানা নেই, গুমরে গুমরে ছিলেন কিনা তাও বলতে পারবেন না — দুঃখিত হয়েছিলেন, মৃত্যুসংবাদে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। যতটা বিস্মিত হয়েছিলেন ততটাই কি ব্যথিত হয়েছিলেন? কিন্তু কান্না আসেনি — কান্না পায়নি। বাড়ির লোকদের কান্না দেখে, শোকের স্বচ্ছলতা দেখে ওর ভেতরে ভেতরে মন বাবার জন্যে ব্যথাতুর হয়েছিল — অপরের চোখে জল দেখলে নিজের চোখে জল আসা যেমন একটা শারীরিক প্রক্রিয়া — তেমন প্রক্রিয়াও ওর ভেতরে একটু কাজ করাতে শুরু করেই থেমে গিয়েছিল — কেমন যেন মুহূর্তে মনে হয়েছিল, শোকের মধ্যে নিজের শূন্যমনের প্রচার যতটা রয়েছে, প্রথা যতটা রয়েছে, মৃত মানুষটির জন্যে ব্যথা বোধহয় ততটা নেই। তাই চোখে জল আসতে গিয়ে এল না। চোখে জল আসবার মত সুলভ ও সস্তা পথও তিনি যেন বেছে নিতে পারলেন না। তাছাড়া এই সব কান্নার মধ্যে এক ধরনের হীনপক্ষপাতিত্ব যেন তাঁর সামনে উগ্র হয়ে উঠছিল। নিচের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে আসছিল, কই পুরবালার মৃত্যুতে তো এমনভাবে কেউ কাঁদেনি? বাড়ির মেয়েরা একটু লোক-দেখানো চোখের জল মুছেছিল বিনয়বাবুকে দেখে এই মাত্র। এমন শোক তখন কোথায় ছিল? বাবার জন্যে শোকের প্রাবল্য ও উচ্ছ্বাস দেখে বার বার মনে হয়েছে — শোকের ব্যাপারে তাঁর স্ত্রীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকে বঞ্চিত করে এখন বাবার জন্যে চোখের জলের এত ধূমধাম বিনয়বাবুর মনে কেমন যেন বিস্বাদ এনে দিত। তাছাড়া তিনি বুঝতেন চারদিক থেকে তাঁর চোখের জলের দাবী আসছে। না, এ দাবী তিনি স্বীকার করবেন না। কই যখন পুরবালার মৃত্যু হয়েছিল — তখন তো কেউ চোখের জলের দাবী করতে আসেনি? পুরবালা মানুষ নয় — সংসারে পুত্রবধূ ছিল বলে কোন দাম ছিল না। বাবার মৃত্যুতে পুরবালাকেই বেশী করে মনে পড়েছিল। না, স্ত্রীর জন্যে শোক করিনি — বাবার জন্যে করব না। (বাবার জন্যে কাঁদতে বসলে পুরবালার স্মৃতিকে অপমান করা হবে) পুরবালার জন্যে কোন অনুভূতি যে বিনয়বাবুর নেই — বাবার জন্যে কাঁদতে বসলে পুরবালার আত্মা যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে।

তাছাড়া পরিবারে এই প্রথম মৃত্যু — আমার জীবনে তো মৃত্যুশোক এই প্রথম নয়। হ্যাঁ, পুরবালা আমাদের সংসারের লোক হলেও মৃত্যুর ব্যাপারে, শোকের ব্যাপারে, সে যে আমাদের সংসারের লোক ছিল না — একথা কি প্রমাণ হয়নি? বাবার মৃত্যু আমাদের সংসারের প্রথম মৃত্যু — পুরবালার মৃত্যু আমাদের সংসারের প্রথম মৃত্যু নয়! বাবার মৃত্যু আমার কাছে প্রথম মৃত্যু নয়। তখন যখন কাঁদিনি — এখন কাঁদবার জন্যে এদের দাবী আমি স্বীকার করব না। পুরবালার মৃত্যুকে যে কত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবহেলার সঙ্গে একত্রে নিয়েছিল বাবার শ্রাদ্ধের সময় বাবার মৃত্যুর পর একথাই বার বার ক্ষোভের সঙ্গে ও প্রায় অভিমানের সঙ্গে বিনয়বাবুর মনে পড়ছিল। তাঁর স্বাভাবিক চালচলনে সবাই মুগ্ধ ক্ষুণ্ন হয়েছিল — একথা তিনি বুঝতেন। এমনকি যারা সান্ত্বনা দেবে ঠিক করেছিল — কান্নাকাটি না দেখে আহত হল — নিরাশ হল — নৈরাশ্য গোপন করবার জন্য অপ্রতিভভাবে মন্তব্য করেছিল — বড্ড চাপা — মন কাঁদলেও চোখের জল ফেলবে না। এ যে তাদের আন্তরিক ধারণা নয় — এমন ধারণাও তাঁর হয়েছিল। ভাই-বোনেরা বাবার মৃত্যুতে যতটা দুঃখিত হয়নি — তাকে কাঁদতে না দেখে অনেক বেশী মর্মাহত হয়েছিল। কিন্তু বিনয়বাবু অস্বাভাবিক রকম স্বাভাবিক থেকে শ্রাদ্ধশান্তি শেষ করে বিনা উচ্ছ্বাসে বিদায় নিয়ে কর্মস্থলে ফিরে এসেছিলেন। চলে আসবার সময় যে কান্নাকাটি হয় — ভাইবোনেরা তখনও কান্নাকাটি করে দাদাকে শেষবারের মত শোক করবার উদার সুযোগ দিয়েছিল। তিনি শান্তচিত্তে সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে চলে এসেছিলেন। পুরবালার মৃত্যুতে যে অস্ফুট সান্ত্বনা গুরুজনদের কাছে শুনেছিলেন — সেই সান্ত্বনা তেমনি অস্ফুট নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বলেছিলেন। না কাঁদবার জেদ তো শেষ পর্যন্ত জয়ী করে যখন ট্রেনে করে কর্মস্থলে ফিরে গেলেন — তখন যেন বুঝতে পারলেন, না কাঁদবার জেদকে বজায় রাখতে কি ভীষণ জুলুম নিজের ওপর করতে হয়েছে।

বিনয়বাবুর পরে দুই ভাই। কিছু আগেই তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। বিপত্নীক বলে ওদের স্ত্রীরা তাকে যত্নআত্তিও করত ঘোমটার আড়াল থেকে — তার ভালই লাগত। কিন্তু তবু, ভাইয়ের এই দাম্পত্য জীবন যে তাকে পুরবালার কথা মনে করিয়ে দিত ঠিক তাও নয়, ঠিক যে ঈর্ষা হত — তাও নয়, শুধু মনে হত ওদের স্ত্রীদের ওপর ছোট ভাইরা প্রকাশ্যে অনেক মনোযোগ দেয়। এর জন্যে ভাইদের ওপর তাঁর ঈর্ষা হত না — তাঁর শুধু মনে হত — বাইরের লোক লজ্জাকে বড় বেশি আমল দিয়ে তিনি নিজের দাম্পত্য জীবনকে নষ্ট করেছেন। যে মনোযোগ ও আকর্ষণ পুরবালার ওপর ছিল — বাইরের লোকদের অত আমল দিয়ে তিনি যেন সেই মনোযোগ ও আকর্ষণকে প্রকাশ না করে নিজের ও পুরবালার ওপর অবিচার করেছেন। বাইরের লোক মরবার পর একবেলাও পুরবালাকে মনে রাখেনি। তাই এবার বাইরের লোকদের চোখের জলের দাবীকে অগ্রাহ্য করে বাইরের লোকদের আমল দিতে চাননি। অথচ ছোট ভাইরা কেমন অনায়াসে স্ত্রীদের ওপর মনোযোগ

দেয়। তিনি তো পারেন নি। তার ঈর্ষা হয় না, বাইরের লোকলজ্জাকে আমল দেওয়াতে বাইরের লোকদের ওপর বা নিজের ওপর রাগ হয়। কেবল মনে হয়, বুদ্ধির দোষে, সাধু-সচ্চরিত্র বলে নিজেকে পরিচিত করতে গিয়ে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন — ঠকেছেন।

বিনয়বাবুর ঠিক পরের ভাই-র স্ত্রী-ই এখন প্রথম পুত্রবধূর মর্যাদা পাচ্ছে। মা'র পরেই এখন তাঁর স্থান। এই জিনিষটি বিনয়বাবুর চোখে লাগত — কেমন অসহ্য মনে হত। মনে হত, তাঁর স্ত্রীর অধিকার আত্মসাৎ করছে। পুরবালার অধিকার চুরি করে নিচ্ছে এই বৌটি। ক্রিয়াকর্মে বাড়ির জ্যেষ্ঠা বধূর মর্যাদা ওকে দেওয়াতে বিনয়বাবুর কেবলই মনে হত — তাঁর স্ত্রীর ওপর অবিচার করা হচ্ছে — স্মৃতিকে বিনামূল্যে বিদায় দেওয়া হচ্ছে — স্মৃতিকে অপমান করা হচ্ছে।

কদাচ বিনয়বাবু শ্বশুড় বাড়ি যেতেন। আর কিছু না হোক — শ্বশুড়বাড়ি গেলে স্ত্রীকে মনে পড়ে বেশি করে — পুরবালার কথা শুনতে পাওয়া যায় — পুরবালার জন্যে দু'ফোটা শান্ত চোখের জল শ্বাশুড়ীর চোখে দেখা যায়। শালীরাও বিনয়বাবুকে দেখলে দিদির কথা বলে ছলছল চোখে। বিনয়বাবু ভাবেন শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা তাকে দেখলেই পুরবালার কথা মনে আনে। তাকে দেখলেই সবাই কেমন বিষণ্ণ হয়ে যায়। পুববালাকে মনে পড়বার বিষণ্ণতা। তবু তাকে দেখে সবাই বিষণ্ণ হয — এতে নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয় না। বরং এই বিষণ্ণতার মধ্যে একটা মর্যাদা আছে। পু ালার কথা বলে যেন তাদের বুকের ভার হাল্কা হয়, পুরবালার কথা বলতে ভালবাসে, পুরবালাকে ভুলতে চায় না। তিনি যে পুরবালার জন্যে আর বিয়ে করতে চাচ্ছেন না — এতে তাঁদের গর্ব — ও বিনয়বাবুর জন্যে সম্ভ্রমবোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন। যদিও মুখে তাকে বিয়ে করতে শ্বশুরও শ্বাশুড়ী দু'জনেই বলেছেন। ছোট শালী দু'টিই বিবাহিত — দিদির জন্যে জামাইবাবু আর বিয়ে করছেন না — এ গৌরব যেন আর তাদের স্বামীর কাছে বলে বলে শেষ করতে পারছে না — বিনয়বাবু তা জানতেন। পুরবালার আপনজন বলেই শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়া তাঁর ভালো লাগত। কিন্তু তিনি যেতেন কদাচ।

আর বিনয়বাবুর নিজের বাড়িতে কেউ তাকে মনে রাখেনি। এ বাড়ির লোকদের বিনয়বাবুকে দেখলে হয়ত পুরবালার কথা মনে আসে। তবে সেই স্মৃতিকে কেউ লালন করতে চায় না। কেবলই আর একটি স্ত্রীকে আনবার কথা বলে — পুরবালাকে হয়ত সম্পূর্ণ ভুলবার জন্যে। পুরবালার স্মৃতিকে এরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

শর্মিলার ঘরের দরজা খোলবার শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণে ভোর হল। কি করে যে সকাল হবার পরও এতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে — আশ্চর্য। আসলে সুকুমার কলেজে পড়ায় বলে দশটা পাঁচটা কাজ করতে যেতে হয় না তো। তাই ওদের ওঠবার ঠিক নেই — যেদিন বেলা করে কলেজ — সেদিন বেলায় উঠবে। একটা অভ্যাস না থাকলে কি চলে?

কিন্তু যতই শর্মিলা-সুকুমারের দেরীতে ওঠবার চিন্তায় নিজেকে আটকে রাখতে চান — দরজা খুলবার শব্দের সংগে সংগে বিনয়বাবুর বুক যে কাঁপতে শুরু করেছে — তা কোন চিন্তাতেই ঢাকা পড়তে চায় না। এতক্ষণ পুরানো দিনের চিন্তায় বেশ অন্যমনস্ক হয়ে সময়কে পাশ কাটিয়েছেন। এবার যেন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন। এতক্ষণের স্মৃতির সব রেশ যেন দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তিনি যে সোজাসুজি জন্মদিনের বিপদের মুখোমুখি, এমন বিচলিত ভাব আর অস্থিরতাকে যেন তিনি আর আজকাল সহ্য করতে পারেন না — রীতিমত কষ্ট হয়। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এখন যেন বড্ড কষ্ট দেয়। উদ্বিগ্ন হবার ওপর এমন একটা বিতৃষ্ণা আছে তবু তা যেন আজকাল বড্ড ঘন ঘন আসে — অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিষ্ঠুরভাবে নিবিড় হয়ে আসে। এই উদ্বেগ ও অশান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতাকে প্রতিরোধ করবার শক্তিও যেন আজকাল এমন কমে আসছে — এদের দৌরাত্ম ও অত্যাচার এমন অনায়াস হয়ে উঠছে যে, আর সহ্য হয় না। তবুও তিনি এই বিচলিত দুশ্চিন্তাকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে যেন একটা চিন্তার আশ্রয় চাইলেন। আজ এদের শ্বাশুড়ী বা দিদিশ্বাশুড়ী বেঁচে থাকলে কি শর্মিলা এত বেলা করে উঠতে সাহস করত? মনে হয় না। হয়ত শ্বাশুড়ী থাকলে শর্মিলা কিছু বলবার আগেই সাত সকালে বিছানা ছাড়ত। এখন জানে, দিদি শ্বাশুড়ী বা শ্বাশুড়ী থাকলে এত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত না। হয়ত আজ স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করে শ্বাশুড়ী বা দিদিশ্বাশুড়ী নেই বলে শর্মিলা মনে মনে খুশীই। তবে আজকালকার মেয়ে স্বাধীনতা না দিয়ে উপায় ছিল কই? কিন্তু এই ভাবনাটি কোন দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে আনতে পারে না। এমনকি এই ভাবনাটিকে বিনয়বাবু বিশ্বাসও করেন না। ভেতরে ভেতরে ভাবনাটির মধ্যে কোন জোর ছিল না। আগে বেলা করে উঠলে তিনি হয়ত আজ আরো খুশী হতেন। বরং শর্মিলা দরজা খুলে বাইরে বের হতেই তিনি উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায়, অশান্তিতে আর অস্থিরতায় অসহায় মনে করছেন নিজেকে। ওর দেরীতে ওঠবার জন্য আক্ষেপ শক্তিহীন আত্মপ্রতারণা বিনয়বাবুর কাছে যেন প্রকাশ্য হয়ে ওঠে। এই স্পষ্ট উচ্চারিত আত্মপ্রতারণা তিনি দেখেও না দেখবার ভান করেন। আত্মপ্রতারণার গ্লানিও যেন মনে ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না।

এবার বিনয়বাবুর মনে হল, রোদের তাপ বাড়ছে। বারান্দার ইজিচেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর নিজের ঘরে এসে অত্যন্ত নিঃশব্দে একটি সোফায় বসে পড়েন। কাজটি এত আস্তে করেন — যেন বাইরের কেউ তো বটেই, নিজেও যেন জানতে না পারেন। নিজের অস্তিত্বকে যেন তিনি গোপন করতে চাইছেন। নিজের বেঁচে থাকাকে যেন নিঃশব্দে করতে চান — এই নিঃশব্দের মধ্য দিয়ে যেন শর্মিলাকে মুহূর্তের জন্যে ভুলিয়ে দিতে চান, তিনি বেঁচে আছেন।

অন্যদিকে আরো বেলা পর্যন্ত বারান্দায় বসে থাকেন। শর্মিলা এসে হয়ত দু'একটা কথাও বলে যায়, ঐ সময়টুকুর মধ্যে। কিন্তু আজ তিনি ঐ সময়টুকুকে বারান্দাতে

অরক্ষিত মনে করেন, সময়টুকুকে বাইরে নিরাপদ মনে করেন না। যদিও জানেন, এই ঘরেও শর্মিলা আসতে পারে। তবু বারান্দার চেয়ে নিজের ঘরকে কেন জানি অনেকটা নিরাপদবোধ করেন। হয়ত ক্ষীণ বিশ্বাস, বারান্দায় তাঁকে না দেখে শর্মিলা যদি তাঁর কাছে আসবার সময়টি কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত রাখে। যতটুকু সময় পাওয়া যায়, যথালাভ।

ঘরের চারদিকে মৃত নরনারীর ফ্রেমে আটা বাঁধানো ছবি। একটা মৃতলোকের পরিবেশের মধ্যে তিনি বাস করেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবার চেষ্টা করেন — কিন্তু উদ্বেল দীর্ঘনিঃশ্বাসের বিলাসিতাকে বেশী প্রশ্রয় দেয় না। যারা মরে গেল সবাই তাঁকে ছেড়ে একে একে চলে গেল। যৌবনের সূচনা থেকে মৃত্যু তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করে চলেছে। মৃত্যুর এই গায়ে পড়া সামাজিকতায় তাঁর জীবন নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব হয়ে উঠল। প্রতিটি মৃত্যুর আঘাতে তাঁর জীবনের বন্ধন কেমন শিথিল হয়ে গেছে। প্রতিটি মৃত্যু যেন তাঁকে যারা বেঁচে থাকল তাদের কাছ থেকেও দূরে নিয়ে গেল। তিনি যেন কেমন সুদূর হয়ে গেলেন। বাবা, মা, স্ত্রী,পুত্র, পুত্রবধূ — সবাই একে একে ছেড়ে চলে গেল। তিনি কেমন সুদূর হয়ে অস্পষ্ট হয়ে আড়ষ্ট হয়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে লাগলেন। আর যারা বেঁচে রইল — তিনি তাঁদের এড়াতে চান। এদের ভীড়ের চেয়ে তাঁর নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব একা ঘরটি অনেক কাম্য। ঐ জন্মদিনের ভীড়ের চেয়ে এই শূন্য ঘর নিঃস্ব ঘর অনেক শান্তির, স্বস্তির। জন্মদিনে তিনি যে নিসঙ্গতা ও একাকীত্ব বেশী করে বোধ করেন তা নয়, নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হয় ঠিক তাও নয়। কেবলই মনে হয়, অপরে তাঁর বেঁচে থাকাটিকে এখন আর দেখতে চায় না। তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি মরে গেলে এঁরা সসম্মানে তাঁর স্মৃতি পূজো করবে। তাঁর বেঁচে থাকাটাই তাঁর স্মৃতিপূজোর বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাঁর বেঁচে থাকবার জন্যে, তাঁর মৃত্যু না হবার জন্যে এরা তাঁর মৃত্যুতে কাঁদতে পারছে না, শোক করতে পারছে না, স্মৃতিকে পূজো করতে পারছে না। তিনি তাঁর জন্যে এদের কাঁদতে সুযোগ দিচ্ছেন না, শোক করবার অবসর দিচ্ছেন না। এদের কাঁদবার আকাঙ্খা, শোকের লালসা থেকে তিনি এদের বঞ্চিত করছেন। তিনি যেন অনুভব করেন, প্রতিটি জন্মদিনে তাঁর আত্মীয় স্বজন তাঁর জন্যে শোক করতে না পারবার বেদনা অনুভব করে, তাঁর স্মৃতিকে পূজো করতে না পারবার বঞ্চনা অনুভব করে। মৃত্যু যে তাঁর বহুদিনের পাওনা — প্রতি জন্মদিনে, না মরবার কুণ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি তা মর্মে মর্মে স্মরণ করেন। প্রতিটি কনিষ্ঠতম আত্মীয় যেন তাকে মরবার জন্যে তাগাদা দিয়ে যায়। জন্মদিনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি মৃত্যুর তাগাদা অনুভব করেন।

নিজের ঘরের জীবনকে তিনি চিরকাল গৌণ করে দেখতে চেয়েছেন নিজের কর্ম-জীবন থেকে। প্রতিবারই তাঁর ঘরের জীবন সোচ্চার হয়ে উঠেছে, উৎকট হয়ে। মেলোড্রামা হয়ে উঠেছে। বিয়ে না করে ভেবেছিলেন, বিয়ে না করে সমস্ত নাটকীয়

ঘটনা থেকে নিজের ব্যক্তিগত ও ঘরের জীবনকে নিষ্কৃতি দিলেন — সমস্ত অতিনাটকীয় ঘটনার সম্ভাবনা ও সুযোগ থেকে নিজের জীবনকে ঘটনামুক্ত রাখলাম। কিন্তু তা আর হল কই ? মীরাটে যখন তিনি ছিলেন তখন অফিসের একটা পিওন ছিল — একজন কালোকুচকুচে দাড়ি ও বাবড়ি চুল — মাঝে মধ্যে তাঁর হিষ্টিরিয়ার মত হত। তখন সকলের মনোযোগ গিয়ে পড়ত ঐ লোকটির ওপর। ডাক্তার ছিলেন একজন খাস স্কচ। একদা সেই সাহেব ডাক্তার বলেছিলেন — ওর দিকে তোমরা অত মনোযোগ দিও না — তা হলে ওর অসুখ আর কোনদিন সারবে না। এমনিতেই দেখ না, মনোযোগ কেড়ে নেবার জন্যে কেমন উৎকট চুলদাড়ী রেখেছে। হয়ত পরীক্ষা করলে এও প্রমাণ হয়ে যেতে পারে, নিজেকে অপরের মনোযোগের কেন্দ্র করবার জন্যেই এই অসুখ। ডাক্তারের এই উক্তির সত্যমিথ্যার তিনি জানেন না। কিন্তু মাঝে মধ্যে মনে হত — তারও নির্ঝঞ্ঝাট ঘরের জীবন তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে ঐ ধরনের অদ্ভুত সশব্দে সোচ্চার হয়ে উঠত। নিজের মৃদু জীবন হঠাৎ প্রবল ধমকে যেন চোখে পড়বার মত উৎকট ও উগ্র হয়ে দেখা দিত। সকলের মনোযোগে গিয়ে পডত তাঁর ঘরের জীবনের ওপর। ঘরের জীবন অশোভনভাবে প্রকাশ্য হয়ে উঠত। এতদিন ছিল মৃত্যু — যেন ঐ হিষ্টিরিয়ার মত তাঁর জীবনে অসঙ্গত নাটক করে গেছে — অবাঞ্ছিত দর্শকদের নেমতন্ন করে এনেছে। মৃত্যুর বিস্ফোরণে ঘরের জীবন ছিটকে বাইরের জীবনে গিযে পড়েছে। সকলে চমকে উঠছে। এখন হয়েছে জন্মদিন — তাঁর জীবনের এক নূতন হিষ্টিরিয়া, অপরের মনোযোগের কেন্দ্রে নিজেকে এনে নিজেকে বিপর্যস্ত করা। এতদিন তিনি অপরের জন্যে শোক করেছেন — এখন অপরে তাঁর জন্যে শোক করবার সুযোগ চাচ্ছে। তিনি যেন জন্মদিনে জন্মদিনে তাঁর জন্যে শোক করবার সুযোগ চুরি করে ওদের কাছে লাঞ্ছিত হন, কৈফিয়েৎ দেবার আন্তরিক তাগিদ বোধ করেন। তাঁর জন্যে শোক করবার অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজের জন্মদিনে বেঁচে থেকে তিনি যেন নিজের কাছে ও অপরের কাছে অপরাধী হয়ে থাকেন। নিজেকে যত আড়ালে রাখতে চেয়েছেন, নিজেকে যত গৌণ করতে চেয়েছেন — ততই প্রকাশ্য হয়েছে — ঘর যেন বাজারের সঙ্গে মিশে যেতে চেয়েছে। আজও জন্মদিনে সকলে তাঁর কাছে আসে শ্রদ্ধায় নয়, ভক্তিতে নয়, ঠিক যেন বিস্ময়েও নয় — আসে কৌতূহলে, ... মিউজিয়াম দেখবার কৌতূহলে, হয়ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই বটগাছটি দেখবার কৌতূহলে। হয়ত কৌতূহলেও আসেনা — তাঁকে দেখতেও আসে না, আসে নিজেদের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদ করতে, উৎসব করতে — শুধু তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্য করে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করবার একটা সুযোগ হয় বলেই আসে। আর ক্রমে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখবার কৌতূহল রোধ করে — জন্মদিনে নেমন্তন্ন শুনেই আত্মীয়দের মনে পড়ে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তাই কৌতূহলে তাকে দেখবার পর যেন এতকাল বাঁচবার জন্যে কৌতূহল অনুযোগে পরিণত হয়। তাঁর বেঁচে থাকাটি যেন একটা অনধিকারী হিসেবে বেঁচে

থাকা — জীবনকে চুরি করে ধরে রাখা। জন্মদিনে ধরা পড়ে যান। সবাই যেন ঘৃণিত ভাবে চোরাই মাল দেখে চলে যায়।

অপরের চোখে চোরও চোরাইমাল দেখবার ঘৃণা তাঁকে কেমন একটু উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এবার ইজিচেয়ারে বসে থাকা কঠিন হয়। ক্ষোভ বা উত্তেজনা তাঁর চট করে হয় না — আর আগের মত তিনি তা দমন করতে পারেন না। আগে যেমন নিজেকে সহজেই দমন করতে পারতেন — আজকাল নিজেকে শান্ত করতে সময় নেয়। ঠিক নিজেকে শান্ত করতে পারেন না — রাগ বা ক্ষোভ তাদের তীব্রতা হারিয়ে জোর নষ্ট করে একসময় তারই মত বৃদ্ধ ও জীর্ণ হয়ে নিঃশেষ হয় — কেবল তিনি নিঃশেষিত হন না। তাছাড়া একটা রাগ বা ক্ষোভ একা আসে না। একটা ক্ষোভ ও উত্তেজনা আর পাঁচটা রাগ বা উত্তেজনা বা ক্ষোভকে ডেকে নিযে আসে। সবান্ধবে এগুলো আসতেই থাকে। অনেক ক্ষোভের স্মৃতি, অনেক বঞ্চনার বেদনা, অনেক উত্তেজনার ও অপমানের তাপ এসে সমস্ত মনকে উত্তপ্ত করে তোলে। তখন এদের অস্বীকার করবার শক্তি যে আগের মত নেই — এই ক্ষোভ নতুন করে অনুভব করে পুরানো ক্ষোভগুলো ম্লান করে দিতে চান। কিন্তু তাতে মনের রক্তক্ষরণ কমে না। রাগের পর নিজেকে রক্তহীন ও দুর্বল লাগে। এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ। বড় রাগেন না। আর রাগলেও বাইরে তা প্রকাশ পেত না — এমনকি তিনি যে রাগ করেছেন তাও কাউকে বুঝতে দিতেন না। সেই অপ্রকাশিত, অকথিত ক্রোধ আজ এমন সময মাঝে মধ্যে এসে হাজির হয় যখন তাঁর আত্মগোপনেব শক্তি আগেব মত আর নেই। এখনও রাগলে প্রকাশ করেন না — হৈ চৈ তো নয়ই — কেমন গুম হযে থাকেন অনেকক্ষণ। রাগলে আগের মত স্বাভাবিক হতে পারেন না আজকাল। রাগলেও সেই স্বাভাবিক হবার শক্তি কেমন করে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। তাছাডা শরীরও খারাপ হয়। তাই রাগ হওয়াকে তিনি বড ভয় করেন। রাগ হতে চান না — রাগ না হবার চেষ্টা করেন।

পত্রিকাটি আবার টেনে নেন। মোটামুটি দেখা হযেছে। এবপর খুটিযে খুটিযে পডবেন — বিজ্ঞাপনগুলোও বাদ যাবে না। কর্মখালী থেকে খেলার খবর পর্যন্ত। একটু বেলা হলে শর্মিলাদের ঘর থেকে বাংলা খবরের কাগজগুলো শর্মিলা দিয়ে যায় — বিনয়বাবুর স্টেটসম্যান নিয়ে যায়। খুলে প্রথমেই শোক-সংবাদ। হযত দু'পত্রিকায় একই ব্যক্তির নাম — বাংলা কাগজে নূতন দেশী নামও পাওয়া যায়। শোক-সংবাদ পড়তে পড়তে কত মৃত লোকের নাম জানা হয়ে গেল তাঁর। যাই হোক, বাংলা পত্রিকাটি খুলে হয়ত সেই একই লোকের শোক সংবাদ দেখেন — মৃত ব্যক্তি কম বয়সী হলে আঘাতটি আগের মত না হলেও, মনে হয়, ঐ কম বয়সী মানুষটির মৃত্যুর সংবাদ বড্ড রটে গেল। মনে হয়, দুনিয়ার যাবতীয় বৃদ্ধকে লজ্জা দেবার জন্যেই ঐ অল্প বয়সী মানুষটির শোকের বিজ্ঞাপন। তারপর তিনি অন্যান্য সংবাদের মধ্য আত্মনিমগ্ন হয়ে যান — তবু মাঝে মধ্যে মৃতব্যক্তিটির ফটো থাকলে তা হঠাৎ

হঠাৎ দেখতেন — দেখে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা কিছু ধারণা করতে চাইতেন — অন্য সংবাদ পড়তে পড়তেই।

দেখলেন, শর্মিলা নিচে চলে গেল। নিচে গেলে আবার তাঁর ঘরে আসতে দেরী হবে। কিন্তু আশ্চর্য, হাঁফ ছেড়ে বাঁচবার পরিবর্তে, নিষ্কৃতিলাভের পরিবর্তে, তিনি যেন বেশ একটু হতাশই হলেন। মনে হল: শর্মিলা একতলায় চলে গিয়ে তাকে আরো কিছুক্ষণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে দিল। তিনি যে কিছুক্ষণের জন্যে পরিত্রাণ পেলেন -- একথা তাঁর একদম মনে পড়ল না। একটু আগে শর্মিলার চোখে না পড়বার জন্যে বারান্দা থেকে ঘরে চলে এসেছিলেন — শর্মিলার তাঁর কাছে আসবার সময়টি বিলম্বিত হোক — কিছু আগে এই ছিল তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। এখন যখন দেরী করে শর্মিলার এঘরে প্রবেশ অনিবার্য -- তখন আরো অনেকক্ষণ দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে বহন করতে হচ্ছে এই সম্ভাবনায় ক্লান্ত বোধ করতে থাকেন। কেমন যেন তাঁর মনে হয়, মনের ভেতরে একটা আকার-প্রকারহীন হতাশা বোধ রয়েছে — যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করে তা বের হয়ে আসে। অতি তুচ্ছ বিষয়কেও হতাশা বহন করে নেয়। নিজেকে আবার কেমন অতিথি অতিথি লাগে। নিজের তৈরী করা বাড়িতে, নিজের তৈরী করা সংসারে তাঁর যেন কোন জোর নেই। যেন নিজের বলে অনুভব করে হুকুম করতে পারেন না। নিজের অজান্তে ও নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কুণ্ঠা যেন তাকে লোহার ফ্রেমের মত ঘিরে বয়েছে। তা থেকে বের হয়ে আসবার সামর্থ যেন এ বয়সে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। শর্মিলা সুকুমারের বিয়ের পর থেকে আস্তে আস্তে কেমন করে যেন তিনি মান্য অতিথিতে পরিণত হয়ে গেছেন। সংসারের ওপর আগের জোর যেন কমে গেছে। অথচ সুকুমারের বিয়ের আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বাড়ির কর্তা। সব কিছু তাঁর হুকুমেই চলত। ওদের বিয়ের পর থেকেই নিজেকে কেন যেন মান্য অতিথি মনে হতে থাকে। ওদের হাতে সংসার। দু'দিনের মান্য অতিথিকে যতটা সৌজন্যমূলক ব্যবহার করা দরকার তা করে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় সেই আপন নাতি-নাতবৌ সম্পর্ক? ওদের বিয়ের পর থেকে কেমন করে কর্তার পদ থেকে মান্য অতিথির পদে বদলি হয়ে গেছেন, নিজে তা টেরও পাননি ভাল করে। এমন বদলির পরে যেন আস্তে আস্তে টের পাচ্ছেন — বুঝতে পারছেন। অথচ জন্মদিন না এলে তিনি তা টের পেতেও চান না --- বুঝতেও চান না। তিনি কি নিজের অজান্তেই কর্তার পদ থেকে সরে দাড়িয়েছেন? বেঁচে থাকবার কুণ্ঠাই কি তাকে কর্তার পদে থাকতে দেয়নি। কর্তার আত্মঘোষনা ও কর্তা হলে যে আত্মপ্রচার অনিবার্য — সেই ঘোষণা ও প্রচারের মধ্য দিয়ে নিজের বেঁচে থাকবার সোচ্চার বিলাপের ওপর বীতস্পৃহাই কি তাকে কর্তার পদে থাকতে দেয়নি? কর্তাপদের আত্মপ্রচারের কুণ্ঠাই কি তাকে মান্য অতিথির পদে নেপথ্যে রাখতে চেয়েছিল? তরুণ রক্ত দেখে তিনি শশব্যস্তে পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি যে তারুণ্যের কিছু আত্মসাৎ করেননি — একথাই কি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন?

শর্মিলাকে কি তিনি কর্ত্রীপদ ঘুষ দিয়ে তাঁর বেঁচে থাকবার ওপর কোন আপত্তি করতে দেননি? দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবার জন্যে শর্মিলাকে অসহিষ্ণু হতে দেবেন না বলে কি শর্মিলার এই পদাধিকার? কর্তৃত্ব নিয়ে লড়াই করবার তো কথাই আসে না। তিনি যে প্রতিপক্ষ এ কথা ভুলিয়ে দেবার জন্যেই কি কর্ত্তার পদ স্বেচ্ছায় বিসর্জন? কিন্তু তাতে কি তিনি আরো নেপথ্যে যাননি—নগণ্য হয়ে যাননি? তাকে ভুলে না গিয়ে বরং তাকে নগন্য বলে কি ভাবতে আরম্ভ করছে না? বেঁচে থাকবার লজ্জায় তিনি যে বেঁচে আছেন তাই কি ঢাকা পড়ে গেছে? না, তুচ্ছ হয়ে অনাবশ্যক হয়ে, নগণ্য হয়ে গেছেন। নিজের অস্তিত্বকে গোপন করতে গিয়ে তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্যকে হত্যা করেননি? নিজের এতকাল বেঁচে থাকবার লজ্জায় তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকেই খুন করেছেন। এখন নির্জীব ও শক্তিহীন ব্যক্তিত্বের নেপথ্য-বিলাপ আর কিজন্যে?..... ছেলে বেলায় স্কুল-কলেজ জীবনে বা চাকরি জীবনে গ্রামের বাড়ি থেকে যাবার আগে যাত্রা করে থাকতে হত। গুরুজনরা পঞ্জিকা দেখে দিন ক্ষণ ঠিক করে দিতেন। ভালো সময়ের মধ্যে যাত্রা করতে হবে — হয়ত ট্রেন বা স্টীমার অনেক দেরীতে। হয়ত বা একদিন পরে। তখন যাত্রা করে বৈঠকখানায় শুয়ে রাত কাটাতে হত — অতিথিদের মত। এখনও তিনি যেন মৃত্যুর জন্যে যাত্রা করেছেন। তবু, এখনও তিনি মৃত্যুর নন—জীবনের অতিথি মাত্র। জীবন থেকে যাত্রা করে জীবনের বৈঠকখানায় এসে শেষ আশ্রয় নিয়েছেন— পরমযাত্রার সময় আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছেন। লোকে তার থাকাটাই দেখাছে—অপেক্ষা করাকে দেখছে না।

নিজের হাতে তৈরী বাড়িটাও যেন পর হয়ে গেছে। ঠিক আগের মত নিজের মনে হয় না—কেবল দোতালার এই নিজের ঘর আর ঐ ব্যালকনিটা ছাড়া। সারা বাড়িটি যেন পর হতে হতে এই ঘর আর ব্যালকনির কাছে এসে আটকে রয়েছে। শর্মিলাদের ঘরের দিকে যেতে তাঁর কত সংকোচ হয়—মনে হয় অন্য কোন দূর আত্মীয়ের গৃহে প্রবেশ করবার সংকোচ যেন ওর সারা দেহে মনে ছেয়ে গেছে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই বাড়িটি তুলেছেন। এই বাড়ির প্রতিটি ইটের সঙ্গে তাঁর রক্ত ও পরিশ্রম মিশে রয়েছে। অথচ নিজের গা থেকে যে রক্ত ঝরে যায় তা যেমন পরমুহূর্তেই পর হয়ে যায়—আর আপন বলে চেনা যায় না— বাড়িটিও আজ তেমনি পর হয়ে গেছে। নিজের ঘর আর ব্যালকনি ছাড়া সর্বত্রই তিনি আজ সংকুচিত, কুণ্ঠিত, অপ্রতিভ। শুধু তাই নয়, শর্মিলা এসে যখন তাঁর ঘরদুয়ারগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে শুরু করে দেয়—তখন যদিও তিনি ভালোভাবেই জানেন, ঘরদোর সাজিয়ে ওদিকে অল্পক্ষণের মধ্যেই শর্মিলা চলে যাবে, তবুও নিজের ঘরটি বেদখল হবার অহেতুক উদ্বেগকে তিনি কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেন না। যতক্ষণ শর্মিলা থাকে নিজের ঘরটিও কেমন যেন পর হয়ে ওঠে। বেইমান ঘরটি যেন শর্মিলার কাছে আত্মসমর্পণের জন্য উৎসুক হয়ে আছে। মনে হয় শর্মিলা ঘরে

এসে ঘরটি সাজাতে আরম্ভ করলেই ঘরটি যেন আপন মানুষ পায়—ঘরটি যেন আত্মস্থ হয়। যেন বিনয়বাবুর মুখের উপরেই ঘরটি অশোভনভাবে খুশী হয়ে উঠেছে শর্মিলাকে পেয়ে। মৃত-মানুষগুলোর ছবিগুলোও যেন অনেক সজীব হয়ে উঠেছে—যেন ওদের আড়ষ্টতা চলে গেছে তরুণ উত্তরাধিকারীকে দেখে। এই ঘরেই ছবিগুলোর কাছ থেকে কোন সহানুভূতি না পেয়ে নিজেকে ভয়ংকর বেখাপ্পা লাগে। ছবিগুলোর অকৃতজ্ঞতায় মন যেন অভিমান করতে চায়। শুধু কি তাই, তাঁর মনে হয়, শর্মিলা নিজের হাতে ঘর সাজিয়ে ঐ ঘর সাজানোর মধ্য দিয়েই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে যায়। অকৃতদার ঘর সেইগুলো তাঁর চোখের সামনে অহরহ ধরে রেখে শর্মিলার ওপর আনুগত্য প্রকাশ করে।

ঘর সাজাবার সময়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার সময়ই, তাঁর মন এমন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে—যেন আশ্রয়-ছাড়া হবার, বেকার হবার আতংকে কাতর হয়ে ওঠেন। কই, শর্মিলা যখন কাঁটা বুনতে বুনতে শোফাতে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করে—করতে তাকে—তখন তো এমন মনে হয় না—হয়ত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার সময় শর্মিলা এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয—এমনভাবে তাঁর অস্তিত্ব তখন অগ্রাহ্য করে—ভয় কি সেইখানে—সেই জায়গায়। গল্প করবার সময় বিনয়বাবুর অস্তিত্ব মেনে নেয়—তখন স্বীকার করে—মনে করে—তখন তাঁর গোপন অস্তিত্ব মৃদু মৃদু পরিস্ফুট হতে থাকে—তাই কি ভয় করে না? এই সময় শর্মিলা তাকে মেনে নেয়। ঘরের আসবার পত্র, ছবিগুলোর অবাধ্য উগ্রতাও যেন এই সময় কমে আসে। মেনে নেবার খুশীতে শর্মিলা আরও কিছুক্ষণ বসলেও তিনি অখুশী হন না—কখনো কখনো ভালও লাগে। তাঁর বেঁচে থাকাকে শর্মিলা সরলমনে মেনে নিয়েছে একথা বুঝতে পেরে তিনি ওর সঙ্গে অনেকক্ষণ অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এমনকি কোন বিষয় নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা যা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ তাও তিনি করেন। সুকুমারের কলেজ ক'টা থেকে ক'টা—শর্মিলার দাদারা কোথায় কোথায় কাজ করেন—ওর বাপের বাড়ির আদি নিবাস কোথায় ছিল—পাকিস্তান থেকে কবে এলেন—সম্পত্তি কেন বিক্রী করতে পারলেন না—ব্যাঙ্কের টাকা? তারপর শর্মিলা চলে যেতেই নিজের দিকে তাকাতে ভয় হয়। এতক্ষণ প্রসন্ন থাকবার জন্যে কেমন ভয় করতে থাকে। নিজের বেঁচে থাকবার লজ্জায় কিছুক্ষণ ভুলে তিন যেন নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। উত্তর পুরুষের সঙ্গে সানন্দে কাটাবার অধিকার তাঁর নেই। মনে হয় সারি সারি মৃতের ফটোগুলো যে মনোযোগে তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করছিল—সেই মনোযোগ একজন জীবিত তরুণকে দিয়ে তিনি ফটোগুলোকে ক্ষুব্ধ করেছেন। অথচ ঘরদোর পরিষ্কার করতে এলে এই ফটোগুলোই শর্মিলার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন আগ্রহে সজীব হয়ে ওঠে। তখন? কই তখন তো বিনয়বাবুর ওপর আনুগত্য তুলে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না? তার বেলা? অথচ তিনি যদি একবিন্দু অন্যদিকে মন দিলেন তো অমনি....। তাই যতই মনে করুন বাড়িটি পর

হতে হতে ব্যালকনির বাইরে এসে আটকে গেছে — ঘর আর ব্যালকানি এখন পর্যন্তও — শর্মিলা ঘরে এলে আব ঘর সংস্কার করতে এলেই — ঘরটি এক লহমার মধ্যে পর হয়ে যায়। যেমন এক লহমার মধ্যে মানুষ জীবন থেকে মৃত্যুর চির আনুগত্য গ্রহণ করে — জীবনের দলত্যাগী হয়ে যায় জন্মের মত — তেমনি ঘরটিও। ফটোগুলোও তখন তাকে যেন চিনতে চায় না। আসবাবপত্র, ফটো, বই সব যেন মনিব বদল থেকে বিনযবাবুকে সহায়হীন করে দেয়। নিজেকে একেবারে আশ্রয়হীন মনে হয়। তিনি জানেন এই ঘর, আসবাব পত্র, বই, ফটো এমনকি পর্দাগুলোও যেন তরুণ তাজা মনিবেব জন্যে লালাযিত। তিনি যেন গাযের জোরে এদের দখল করে বেখেছেন। মনে মনে এরা কেউ তাকে চায় না। তাই শর্মিলা ঘর পরিষ্কার করতে এলে — অতখানি জোর খরচ করে নিজের অস্তিত্বকে ঘোষণা করতে হয়।

শর্মিলা চলে গেলে স্বস্তি পান। অনেকক্ষণ ইজিচেযার, ড্রেসিংটেবিল, সোফা, আলমারী, পর্দা, এদের দিকে তাকাতে পারেন না। শর্মিলাকে চলে যেতে দিয়ে তিনি যে এদের ওপর অন্যায করেছেন সেই অপরাধে ও শর্মিলা চলে যাওয়াতে এইসব বিশ্বাসঘাতকদেব মধ্যে যে সরল বিষণ্ণতা ফুটে উঠবে তাকে যেন স্বীকার করতে না হয সেই জন্যে — এই দুই অপবাধ ও লজ্জা আর বেশ কিছুটা অভিমানের জন্যে এদের দিকে না তাকিযে জানলা দিযে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভাবখানা, শর্মিলার দিকে মনোযোগ দিয়েছি — এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছি। শর্মিলার ওপব পক্ষপাত নেই দেখাবার জন্যেই আকাশের দিকে তাকানো। মনে হয় অনেকসময়, কই, আমি শর্মিলার দিকে মনোযোগ দিলে অমনি মহাভারত অশুদ্ধ আব আমাব মুখের পবেই শর্মিলার ওপর....।

শর্মিলার সঙ্গে সাধারণতঃ বারান্দায় বসেই কথাবার্তা বলেন। যত কম ঘরে আসতে দেওয়া যায তত‌ই মঙ্গল। ঘরটিকে যত কম বিশ্বাসঘাতক হতে দেবার সুযোগ দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। সবাই তাকে ছেড়ে যেতে চায় — সবাই পর হতে উৎসুক। প্রথম জীবনের আত্মীযবা তাকে ছেড়ে গেছেন — শেষ জীবনেব আত্মীযরা তাকে সরিযে দেবার জন্যে উন্মুখ। তাঁর শোক করে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সবাই ব্যাকুল। মৃত্যুর পরে তাঁর গুণগান করবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জীবনের বৈঠকখানায় আশ্রয় নিযেছেন — কখন চলে যাবেন সেই বিদায়ের ক্ষণটির জন্যে সবাই অধীর অপেক্ষায রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে কাঁদবার জন্যে লোকে অস্থির হয়ে উঠেছে। অথচ এদের ব্যর্থ করে প্রতিটি জন্মদিনে সার্প মেমরী, সোজা মেরুদণ্ড আর টকটকে রঙ নিযে তিনি হাজির।

স্ত্রী ও ছেলের ফটোর দিকে তাকান। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকেন। হঠাৎ তাকালে যতটা পবিচিত মনে হয়, আপন মনে হয় — একটু বেশিক্ষণ তাকালে যেন দু'জনেই কেমন পর পর হয়ে ওঠে — তেমন আপন আর মনে হয় না। ফটোর দিকে তাকাবার সময় নিজের অজান্তেই এটা আশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠত — একটু পর পর

মনে হতেই নিজেকে সেই পুরানো নিরাশ্রয়ী হবার অখণ্ড যন্ত্রণা পেয়ে বসে। আজকাল শুধু যে একা একা লাগে তাই না, জিনবাসী মনে হয় শুধু তাই না—নিজেকে বড্ড অসহায় লাগে। নিজেকে কেমন অবলম্বনহীন মনে হয়। জানেন, কোথাও গিয়ে তিনি চুপ করে থাকবেন— কেউ এলে তাঁর লজ্জা করে, কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। অথচ একা একা যেমন নিজেকে অসহ্য মনে হয়—তেমনি অসহায় অবলম্বনহীনও বসে থাকতে আর ভাল লাগে না—বের হতেও ইচ্ছে করে না। বাইরের জগত পর হয়ে গেছে—নিজের ঘরও আপন নয়। ছেলে বা বৌয়ের কথা তো বেঁচে থাকতে তেমনি ভাবেননি। বরাং ওরা মরবার পর ওদের বেঁচে থাকা এমন করে মনে পড়েছে—এমন করে ভেবেছেন! বেঁচে থাকতে ওদেব ভুলেই ছিলেন বলা চলে—মরবার পরে এমন করে মনে রইল —এমন দুঃখ দিয়ে দিয়ে মনে থেকে গেল —আর ওদেব ভুলে থাকা সম্ভব নয়।

বেঁচে থাকবার সময় পুরবালা যেমন দূরে সরে থাকত—ছেলেও তাই ছিল বই কি। হোক না একমাত্র সন্তান। মা আব পিসির কাছেই তো মানুষ। মা মরবাব পর পিসির কাছে। মা মরবার পর ঠাকুমাব আদব মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। তারপব ছিল, বংশের প্রথম নাতি। সকলেব আদরে নষ্ট হযে তে বসেছিল। ছুটিতে তিনি যখন আসতেন —ছেলে ধাবে কাছেও আসত না। দূব থেকে একটু দেখে কৌতূহল মিটিযে চলে যেত। বাবা সম্বন্ধে কোন আগ্রহ ছিল না। তাবপর একবাব তিনি ছেলেকে জোর করে কলকাতায এনে একটা স্কুলে ভর্তি করে সেই স্কুলেব বোর্ডিং-এ বেখে দিলেন। ছুটি হলে ছেলে দেশেব বাড়িতেই চলে যেত —তাব কাছে কখনও যেত না। কেবল কলেজে পড়বার সময় একবার একমাসের ছুটিতে তাঁর কাছে সামান্য ক'দিনের জন্যে এসেছিল। তিনি তখন ছিলেন মীরাটে। বিনা চিঠিতে হঠাৎ এসেছিল। তিনি খুশি হয়েছিলেন। তার চাপরাসী ও অধস্তন অফিসাবদের সঙ্গেই প্রায সব সময় কাটিয়েছিল—তাঁর কাছে খুব কমই এসেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল নিজে গিয়ে সব ছেলেকে দেখাবেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝলেন—ছেলে আর চাপবাসীর সঙ্গে যেতে উৎসুক—তখন তাই পাঠিয়ে দিলেন। ক'দিন থেকে ছেলে চলে গেল। ছেলে যাওয়ার পর একই সঙ্গে স্বস্তি ও বেদনা অনুভব করছিলেন। ছেলেব সঙ্গে কি বকম ব্যবহার করবেন এ নিয়ে অস্বস্তি ছিল সবসময। ছেলে চলে যেতে সেই উদ্বেগেব হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ও কিছুটা সুস্থবোধ করেছিলেন। আর ছেলেকে কাছে পেয়েও বুঝলেন ছেলে আর তার নেই। অনেক স্বাধীন—অনেক দূরত্ব। বেদনাও সেই জন্যে বোধ করছিলেন। তাতে এই বেদনাকে তিনি অন্যায্য ভাবেন নি—তাঁর সঙ্গেও তাঁর বাবার এই সম্পর্কই ছিল। এ নিযে তাঁর অস্বস্তিকে তিনি অহেতুক ভেবেছিলেন। ছেলেকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন। ছেলে নববর্ষে বা বিজযার প্রণাম জানিয়ে একটা চিঠিও দিত না। ছোট ভাইদের নববর্ষর চিঠি পেতেন। মনে মনে ছেলের চিঠির প্রত্যাশা করতেন অথচ চিঠি না এলে কোনো আশাভঙ্গ তো

হতই না — স্বস্তিবোধ করতেন! আইন পাশ করবার পর ছেলের প্রথম পত্র পেলেন। ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত যেতে চায়। এখানে আইনের কোর্স শেষ করেই বিলেত যাবে — এই ইচ্ছে। অর্থাৎ অনুমতি ও খরচ তাকে বহন করতে হবে। তক্ষুনি রাজি হযে গেলেন তিনি। ছেলেকে চিঠি দিয়ে দেশের বাড়িতেও জানিয়ে দিলেন। ছেলে নিজে চিঠি লেখায় তিনি যেন একটা আশ্রয় পাপার, ছেলেকে কাছে পাবার আনন্দবোধ করেছিলেন। ছেলের সঙ্গে সহজ ব্যবহারের পথ ছেলেই খুলে দেওয়ায় তিনি যেন বহুদিনের বহুকালের আড়ষ্টতার জড়তা থেকে মুক্তি পাবার সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছিলেন। তখন তিনি ডিসট্রিকট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিযার। বিলেতে ছেলে পাঠাবার সকল রকম সুযোগ ও জানাশুনো তাঁর ছিল। বিলেতে পরিচিতদের সংখ্যা কম নয়। তিনি বিলেত পাঠাবার সকল দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খুশীর চাঞ্চল্য যেন বহুকাল পরে অনুভব করলেন। যদিও বাইরে তা কেউ বুঝতে পারল না। তাঁর স্বভাব সুলভ সংযত ব্যবহারে উচ্ছ্বলতা বা উচ্ছ্বাস বলে কোন বস্তু কেউ কোনদিন দেখেনি।

কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা নানাভাবে কি করতে লাগলেন বিলেত যাবার আগে বিযে করে যাক। কেউ কেউ ইতিমধ্যে পাত্রী দেখতেও লাগলেন। পাত্রীপক্ষের তরফ থেকে তাঁর কাছে নানা প্রস্তাবও আসতে লাগল। তিনি সব কিছু অগ্রাহ্য করলেন। ছেলের বিযের সম্বন্ধ আসবেই জেনে যে চিন্তা তাঁর মনে এল, তা হচ্ছে এখন তিনি ছেলেব পিতা। তাঁর বিযের বয়েস সত্যি সত্যি, চলে গেল। এখন তিনি প্রৌঢ় পিতা। এখন তিনি পাত্রপক্ষের পিতৃস্থানীয়। চিন্তাটি মুহূর্তের জন্যে যেন তাঁর সব কিছু অবশ ও অবসন্ন করে দিল। কিন্তু বিনয়বাবুর বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। তিনি চিঠিগুলো ফাইলে রাখলেন শান্তভাবে। জানালেন, ছেলে এখন বিয়ে করে যেতে ইচ্ছুক নয়—তিনি ছেলের ওপর জোর করতে রাজী নন। মনে মনে নিজেকে বোঝালেন বিয়ের পর বিদেশে থাকা যে কী—নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে কি তা বোঝেননি। ছেলেকে কেন সেই কষ্ট দেবেন? মেম বিয়ে করবে? বেশ তো তাই করুক। তাঁর জীবনও তো কাটল সাহেব মেম নিয়ে। না হয়, মেমে-বৌ আসবে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও অস্পষ্টভাবে না চিন্তা করে পারেন না—মেম-বৌ এলে বাড়ির ওদের বেশ শিক্ষা হয়। কিন্তু, কেন এই চিন্তা করলেন—তা ভাবলেন না। আর চিন্তাকে প্রশ্রয়ও দিলেন না। চিন্তাটিও উঁকি দিয়েই আত্মগোপন করল। ওর উঁকি দেওয়াকে বিনয়বাবু স্বীকার করলেন না। ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। যদিও মনে মনে প্রত্যাশা রইল মেম-বৌ আসবে। মেম এল না। ছেলে সাহেব হয়ে ফিরল। ব্যারিস্টার সাহেব।

প্রাণতোষ দেশে ফিরবার আগেই এই বাড়ি তিনি তৈরী করলেন। নিজের প্ল্যান, নিজের অর্থ, নিজের তদারকী। নিজের মহল ও ছেলের মহল আলাদা করে দিলেন। ছেলের চেম্বারের জন্যে ঘর আলমারী সব তৈরী হয়ে রইল। প্রাণতোষ বাড়ি দেখে খুব খুশী। ছেলের অনুমিত নিয়েই দেশের বাড়ির ও জমিজমা যে অংশটি তাঁর ছিল দুই ভাই-এর ছেলেদের লিখে ছিলেন।

প্রাণতোষ ফেরবার কিছুকাল পরেই বুঝলেন, চেম্বারে কোন ক্লায়েন্ট আসেনা—আসে নানা ইয়ার। আইন কি শিখে এসেছে, ব্যারিস্টারীর কি প্র্যাকটিস হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু মদ্যপানের প্র্যাকটিসটি বিলেত থেকে বেশ ভালো করেই শিখে এসেছে। তাঁর মহলের সামনে দিয়ে আসতে হয় না বলে আর নিজের মহল ভিন্ন বলে গভীর রাতে ঘোর মাতাল হয়ে গৃহে প্রবেশ করত। চাকর, চাপরাশীরা ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসত। তিনি আর মুহূর্ত দেরী না করে ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলে কোন ওজর আপত্তি না করে চোখ বুজে বাবার পছন্দে মত দিল। মেয়েটি ভদ্রবংশের সুশ্রী—বাপের বাড়ির অবস্থাও স্বচ্ছল। লেখাপড়াও জানে। কিন্তু বিয়ের পর প্রাণতোষের স্বভাব তো শোধরালো নাই-ই—স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া শুরু হল, অশান্তি লেগে থাকল—অবশ্য ঝগড়া অশান্তি সবই প্রকাশ্যে। বিনয়বাবু জানতেন, মানুষের স্বভাব সাধারণতঃ খুব একটা বদলে কখনো যায় না— সংশোধন এত সহজ নয়। তাড়াতাড়ি পাল্টানো এত সস্তা নয়। স্বভাব পাল্টান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাব কথা। তিনি প্রতিষেধক হিসেবেই বিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাণতোষকে কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। স্ত্রী বলবে—এই ছিল ভরসা। যখন স্বামী ও স্ত্রীতে অবনিবনা বেশ জোরালো হল—তখন তিনি বিষণ্ন চিত্তে নিজের পরিকল্পনা মত যে কাজ হচ্ছে তা বুঝতে পারতেন। প্রাণতোষ প্রতিমার অবনিবনা চেপে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রাণতোষ যেন প্রতিমাকে গ্রাহ্যই করতে চায় না। প্রতিমাও মনে হচ্ছে সহজে পরাজয় স্বীকার করবার মেয়ে নয়। তাঁর মনে হচ্ছিল এ যেন কে ডমিনেট করবে তার লড়াই। প্রতিমার চাপা আওয়াজ, স্বামীকে নিজের পথে আনতে চাওয়া—এ যেন কেমন বিনয়বাবুর ভাললাগে না। পুরবালার নীরব নতমুখী আজ্ঞাবহ চেহারার কাছে প্রতিমার অল্প ঘোমটার আড়ালে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা ওর ভালো লাগে না। ছেলে যে প্রতিমাকে অগ্রাহ্য করছে—গোপনে ছেলের পৌরুষের ওপর শ্রদ্ধাই হয়। আবার ছেলের মদ খাওয়া, উচ্ছৃঙ্খল জীবন, এও অসহ্য।

বিয়ের বছর না ঘুরতেই অবনিবনা এত চরমে দাঁড়াল—একদিন, যখন বিনয়বাবু অফিসে ছিলেন, প্রতিমা ঝগড়ার শেষ পর্যায়ে একা, কারো কাছে কোন অনুমতি না নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। যখন বেরিয়ে যায় তখন প্রাণতোষ নাকি চেঁচিয়ে বলেছিল, আর এ বাড়িতে ঢোকা হবে না কোনদিন, জেনে যেও। বৌ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে একাই রওনা হয়ে যায়। সঙ্গে দৌড়ে বিনয়বাবুর পুরানো চাকর একটা গাড়ি ডেকে পৌঁছে দিয়ে আসে। বিনয়বাবুর যে নিঃসন্তান খুড়তুতো বোন শেষ পর্যন্ত প্রাণতোষকে মানুষ করেছিল—ধরতে গেলে বর্তমানে তিনিই শাশুড়ীর মত মর্যাদায় রয়েছেন—তিনি তো প্রতিমার ব্যবহারে রেগে ক্ষেপে অস্থির হয়ে উঠলেন। বৌয়ের তেজ তাঁর অসহ্য। তিনি প্রাণতোষকে আবার বিয়ে করবার জন্যে তাগাদা দিতে লাগলেন। শোনা গেল, প্রাণতোষ রাজী। বিয়ে করবার গরজ তাঁর নেই—তবে প্রতিমাকে শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি আবার বিয়েতে রাজি। ব্যাপারটা নিয়ে ভারী

সোরগোল শুরু হল। তিনি চুপচাপ ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রাণতোষের পিসী নাকি পাত্রীর সন্ধানও পেয়ে গেছেন ক'টা। বাড়িতে প্রতিমা নেই। রাত না হতেই পিসী বিছানায় আশ্রয় নেন। প্রাণতোষ মধ্যরাতে চাকরের সাহায্যে আবার উগ্র মদের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে স্যুটবুট সুদ্ধ বিছানায় শুযে পড়ত। বিনয়বাবুর কাছে শুধু পিসী প্রতিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল। তিনি শীতল হয়ে শুনেছিলেন। এখন যেন তিনি সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। নিজেকে সাংখ্যের পুরুষের সঙ্গে বার বার তুলনা দিতেন মনে মনে। ছেলে মদ খায়—একথার জন্যে ছেলেকে কিছু বলা তাঁর রুচিতে বাঁধে। এক হচ্ছে, ছেলে মদ খায একথা বললে যেন ছেলের মদ খাবার একটা স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া হয়—তারপর যতই তিরস্কার করুন না কেন। দুই, রাগ তিনি করতে পারেন না। তিন, তিনি বোঝেন তাঁর গাম্ভীর্য ও নিরীহ নীরবতার পার্থক্য বাইরের লোক বুঝতে পারবে না। তাই তাঁর ভদ্রতা, রুচিশীলতা ও কঠোর হতে না পারাকে লোকে ব্যক্তিত্বহীনতা বলে ভাবতে জানে। চার, ছেলেকে মদ খেতে নিষেধ করলে ছেলের সঙ্কোচ চলে যাবে—ফলে প্রাণতোষ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবে, অগ্রাহ্য করবে—তখন তিনি কি করবেন? ছেলেকে মদ খেতে নিষেধ করে ছেলেকে বিদ্রোহী হবার, তাকে অগ্রাহ্য করবার সুযোগ তিনি দিতে চান না। তিনি যে কঠোর হতে পারেন না—রূঢ় হয়ে কঠিন কথা বলতে অক্ষম— এরও পরিচয় তিনি দিতে চান না ছেলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে। অথচ ছেলেকে নিষেধ না করে তিনি ছেলের স্বাস্থ্য ও চরিত্র নষ্ট হতে দিচ্ছেন—এই গ্লানিও মন থেকে যেতে চায় না। প্রতিমা মনে করছে ছেলেকে শাসন করবার কোন ক্ষমতা শ্বশুরের নেই। বোন মনে করছে, দাদা চুপ থেকে সংসারকে অধঃপতনের পথে ঠেলে দিচ্ছে। আর স্বয়ং তিনি নিজে মনে করছেন, তিনি কি ছেলেকে ভয় করেন? ছেলের অধঃপতনের এই নীরব নির্বিকার সাক্ষী হবার জন্যে সব সময় যে চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে তুলত তা হচ্ছে প্রতিমা কি ভাবছে তাঁর সম্পর্কে। প্রতিমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়াতে তিনি যেন প্রতিমার সামনে মুখ দেখানোর দায় থেকে বেঁচে গেলেন। প্রতিমার স্বল্প ঘোমটার অন্তরাল থেকে যে একটা নীরব তিরস্কার শ্বশুরের জন্যে বরাদ্দ ছিল—তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি যেন কিছুটা স্বস্তি পেলেন। ছেলে ও পিসীর আবার বিয়ের হুমকিকে তিনি আমল দিলেন না। পিসী যখন একটা মেয়ের সন্ধান নিয়ে বাড়িতে একটা বিয়ের মেজাজ তৈরী করবার চেষ্টায় ব্যস্ত হল— তখন, কতক্ষণ পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে জোর করে প্রকাশ না করা যায়—তার পরীক্ষা দিচ্ছেন—নিজেকে এই কথা বোঝালেন। বিয়ের প্রস্তাবকে তাঁর ধৈর্য পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করলেন।

মদ খাবার চেয়েও যা তাঁর খারাপ লাগছিল, তা হচ্ছে ছেলের আরেকটা বিয়ে করবার প্রকাশ্য ইচ্ছে। একটা বৌ থাকতেই আরেকটা বৌ আনতে চাচ্ছে। ভগবান না করুন এই বৌমার যদি কিছু হয়—তবে তো ছেলের তর সইবে না। নিজে

কোনোদিন আরেকটা বিয়ে করলেন না—ধন, মান, স্বাস্থ্য, সম্পদ সব থাকা সত্ত্বেও—নিজে বিপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও। আর ছেলে কিনা....। ছেলে বিয়ে করবার ইচ্ছে প্রকাশ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না—ঠিক যাকে ঈর্ষা বলে তাও যেন বোধ করলেন না। কেবল মনে হল—তিনি বিয়ে না করে বঞ্চিত হয়েছেন—ঠকে গেছেন। নিজেকে আদর্শ পুরুষ করতে গিয়ে তিনি যে ভয়ংকর ভাবে নিজেকে বঞ্চনা করেছেন—ছেলে যেন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। যে সংসারকে যে লোকলজ্জাকে তিনি অতবড় মনে করেছেন—তা যে অতি তুচ্ছ—তাকে যে অনায়াসে বুড়ো আঙুল দেখান যায়—ছেলে তা দেখিয়ে দিল। ছেলের ওপর একটা সম্ভ্রমমিশ্রিত ঈর্ষা তিনি বোধ না করে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, যদি তিনি বিয়ে করতেন, না হয় প্রাণতোষের সৎ মা-ই হোত—তবু, হয়ত সৎ-মা বলেই একটা শাসনে থাকতে পারত, হয়ত এত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ত না। তিনিও সেই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে সংসার পরিচালনা করতে পারতেন। এমন অসহায় বোধ করতেন না। ছেলে স্পষ্ট করে সমাজকে লোকলজ্জাকে অগ্রাহ্য করতে পারল। কই সমাজ তো কিছু বলল না তাকে? আজ তিনি কি পারেন না উচ্ছৃঙ্খল হতে, মদ খেতে? না, পারেন না। লোকমত তুচ্ছ জেনেও, সমাজ ফাঁপা জেনেও তিনি পারবেন না। বাল্যকালের শিক্ষা শিরায় শিরায়। সেই সংস্কারকে অগ্রাহ্য করবার শক্তি তাঁর কোথায়? তিনি স্থির করলেন, প্রাণতোষ যদি আবার বিয়ে করে, তিনি সমস্ত সম্পত্তি কোন সেবাসঙ্ঘে দান করে যাবেন। প্রথমে ভেবেছিলেন প্রতিমাকে দেবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর সাহস হল না। তারপর ভাবলেন, কিছু প্রতিমাকে, বাকী সব দান করবেন রামকৃষ্ণ মিশন বা ভারত সেবাশ্রমকে। কিন্তু ভাবলেন না, প্রতিমার জন্যেই তো প্রাণতোষকে বঞ্চিত করছেন—তাই প্রতিমাকেও কিছু নয়। তাঁর মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি থেকে প্রাণতোষ প্রতিমা সবাই বঞ্চিত হবে। এক পয়সা আয় হয় না ব্যারিষ্টারী থেকে। বাপের পয়সায় আবার বিয়ে করবার সখ। তিনি স্থির করলেন, প্রাণতোষের পিসীকে ডেকে এই সংবাদ জানিয়ে দেবেন। জানিয়ে দিয়ে চুপ করে থাকবেন। ছেলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ভয় ছিল—তবু স্থির করে ফেললেন, বলবেনই।

কিন্তু আজ বলি বা কাল বলি করে করে ক'দিন কেটে গেল। একবার ভাবলেন, বলবেনই বা কেন? তাঁর সম্পত্তি তিনি দেবেন না। 'দেবেন না'—এই কথাটিও সকলকে ঢাকঢোল পিটিয়ে তাকে বলতে হবে এমন কিছু দায় বা বাধ্যবাধ্যকতা তাঁর নেই। সাবধান করে দেবার জন্যে তো? মত যখন নিতে আসবে তখনই বলব? তাঁর মত যদি না নিয়েই বিয়ে ঠিক করে ফেলে তবে তিনি পছন্দমত কোন সময়ে এই চরম সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেবেন। যদি মত না নিয়েই বিয়ে করে তবে সাবধান করে দিতেও তিনি বাধ্য নয়। বেশ উত্তেজিত ভাবেই স্থির করলেন, যদি মত না নিয়েই বিয়ে করে—তবে ছেলেকে বাড়ি থেকে চলে যেতে দেবেন কি না? বিষণ্ন হয়ে যখন বাড়িতে প্রবেশ করেন—তখন মনে হয় বাড়ি করতে না করতেই ঝগড়া

মনোমালিন্য বেধে গেল—বাড়িটি কি অপয়া'? কিন্তু মত না নিয়ে বিয়ে করলে ছেলেকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলার সাহস ও জোর ভেতর থেকে অনুভব করেন না। কেমন যেন ছেলের স্পর্ধায় তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপন শ্রদ্ধা পোষণ করেন। নতুন একটি বৌমার অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য ত্যাগ তাঁকে তাঁর অগোচরে কেমন অপেক্ষায় রাখে। যদিও ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার সিদ্ধান্ত অচল হয়ে রইল। আর এ বিষয়ে তিনি মনোস্থির করে ফেলেছেন।

তিনি অনুভব করলেন, সমস্ত বাড়িতে একটা বিয়ের উদ্যোগ, পাত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গ, নানা পাত্রী নানা গুন ইত্যাদির গোপন আলোচনা চলছে। যতই আলোচনা ও উদ্যোগ চলছিল—ততই ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবার দৃঢ়তা তিনি অনুভব করছিলেন। সেই সংগে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি চিন্তা না করে পারেননি; কই তাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার জন্যে এমন আন্তরিক উদ্যোগ—এমন সজীব চেষ্টা তো দেখা যায়নি। তাঁব মনে হত, তিনি দেশে এলে সবার মনে পড়ত, তিনি বিপত্নীক। রুটিন-মাফিক তাকে অনুরোধ করা হত। একটা মামুলি অনুরোধ, একটা নিষ্প্রাণ গতানুগতিক তাগিদ। যেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার একটা ছুতো ছিল তাকে বিয়ে করতে বলা। তাঁর সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলা যায়—তাই বিয়ের কথা বলা। ওর পিসীও তো তখন ছিল—কই, তখন তো উদ্যম দেখা যায়নি। অবশ্য বললেও আগ্রহ এত আন্তরিক ছিল না বিনয়বাবু ভাবেন, যে বিয়ে আর তিনি করতেন না। তবু তাঁর সম্পর্কে এটা একটা স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট। এ চিন্তা তাঁর মনে এখন অভিযোগ বা অনুযোগ রূপে তেমন জোর করে তুলতে পারে না। কেমন একটা রক্তহীন দুর্বল বিতৃষ্ণা জাগায় মাত্র। মন ক্ষুব্ধ হয় না—বিষণ্ন হয়। আর এই বিষণ্ণতাকে মন থেকে যেতে দিতেও ইচ্ছে করে না। বরং এই বিষণ্নতাকে চুম্বকের মত ধরে সেই সঙ্গে যত অবিচার ও অন্যায় হয়েছে তাদেরই মনে এনে হাজির করতে চান। বেশ বড় রকমের বিষণ্ণতার ভোজের আয়োজন করতে চান। কিন্তু চঞ্চলতা ও অস্থিরতাকেও ভয় পান—এই ভয় চিরকালের। তিনি বোঝেন, গোপনে মনকে চঞ্চল, অস্থির ও শুদ্ধ করবাব একটা মরা খিদে রয়েছে—কিন্তু সহ্য করবার শক্তি নেই—তিনি তাই ক্ষোভের কাবণ পেলে অনায়াসে সময় কাটিয়ে দিতে পারেন বলে মনে হয—সময় যেন তর তর করে এগিয়ে যায়—এগিয়ে যায় জন্মদিনের কথাকে ভুলে জন্মদিনের দিকেই—তবু সেই বিষন্নতার গুরুভোজের সম্ভাবনাও দারুণ ভয়—একটু স্বাদ গ্রহণ করেই আর এগুতে সাহস পান না। অন্যমনস্ক হবার জন্যে তাকে আকর্ষণীয় স্মৃতির সন্ধানে মনকে স্মৃতির স্বয়ংবর সভায় পাঠান।

এমনি একদিনে বাবার সঙ্গে বৌমা এল অল্প ঘোমটা টেনে। আজও সেই সজল চোখ, সেই থমথমে মুখ যেন মনে আসে। ঠিক লজ্জা, না অপমান, ক্ষোভ না পরাজয়, না নিজের ফিরে আসবার গ্লানি ও অসহায়তা— কি যে ছিল আর ছিল না সেই মুখে বলা শক্ত। মাথায় পা ঠেকিয়ে বৌমা যেন একটু বেশিক্ষণ ধরে প্রণাম

করল। প্রণামের এতটা পরমায়ুতে যেন বিনয়বাবু লজ্জা পান। এই প্রণামের মধ্যে কি ছিল — আজ তা ভাবতে ইচ্ছে করে — তখন রাগ করে চলে যাবার জন্যে নীরব ক্ষমা প্রার্থনাই ছিল — হয়ত ক্ষোভ ছিল নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে — তাই প্রণামের মধ্য দিয়ে নিবেদন — হয়ত নিরুপায় হয়ে তাকে ফিরে আসতে হল — বাপের বাড়িতে ঠাঁই হল না — সেই লজ্জা কাটাবার জন্যে পায়ের মধ্যে মাথা রেখে আত্মসংবরণের জন্যে একটু সুযোগ নেওয়া — একটু সময় নেওয়া — আজ মনে হয় হয়ত ছেলের বিরুদ্ধে একটা নিষ্ফল আবেদন — ওর নারীত্বকে অপমান করবার বিরুদ্ধে একটা নম্র অভিমান সেই প্রণামের মধ্য দিয়ে বৌমা পৌঁছে দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এসব পরের ভাবনা। তখন প্রণামের সময়ই একটু বেশি হওয়াতে তিনি বিব্রত হয়েছিলেন — এটুকুই মনে আছে। সেই সঙ্গে মনে আছে, যাক্ ছেলের আবার বিয়ের হুজুক এত অল্পে মিটে গেল — সেই সঙ্গে আবার উদ্বেগও ছিল, ছেলে আবার প্রতিমাকে তাড়িয়ে না দেয়। বৌমাকে দেখে একদিকে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন — একটা উদ্বেগ ও উত্তেজনার হাত থেকে বেঁচেছিলেন। কিন্তু বৌমার আসবার ফলে বিয়ের উত্তেজনা ও উদ্বেগ চলে যেতে নিজের মনেও কেমন একটা শূন্যতা আসে শ্রান্তিকে সঙ্গে নিয়ে। একটা প্রবল অশান্তি অতি অল্পে মিটে যাওয়াতে যেমন একটা ফাঁড়া কেটে যাবার স্বস্তিবোধ করেন — সেই সঙ্গে যেমন প্রবল অশান্তির মুখোমুখি হবার জন্যে মন যে এতটা তৈরী হয়েছিল — তাকে কেমন বেকার ও নিঃস্ব মনে হতে লাগে — অশান্তি না আসবার জন্যে একটু সূক্ষ্ম আশাভঙ্গও বোধ করেন। প্রণাম শেষ করে বৌমা যেন ঘোমটা কমিয়ে দেন। চোখ দুটো জলে ভরা। কিন্তু জল চোখ ছাপিয়ে পড়ছে না। বৌমা একটু শীর্ণ ও একটু রোগা হয়েছেন। চোখের জল তিনি সহ্য করতে পারতেন না কোনকালেই — অথচ সারাজীবন তিনি চোখের জলেই সাঁতার কাটলেন। চোখ ফেরালেন। বৌমার বাবাকে বসতে বললেন।

পিসী বহুবার জানিয়ে গেছেন, বিনয়বাবুর অনুমতি না নিয়ে এ বাড়ি থেকে যাওয়া তাঁকেই সবচেয়ে অপমান। এতে বিনয়বাবুর ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হওয়া উচিত। এমন পুত্রবধূকে ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। তেজ দেখানো জন্মের শোধ ভেঙ্গে দিতে হবে। বিনয়বাবুর আড়ালে অথচ বিনয়বাবু যেন শুনতে পায় এমনি করে পিসী মন্তব্য করেছেন — বিলেত ফেরত ছেলে, সে এখন তুলসী পাতা ধোয়া জল খেয়ে বৌয়ের আঁচল ধরে বসে থাকবে? আবদার। তেজ বের করছি, দাঁড়াও। বিনয়বাবুকে বহুবার তিনি উত্তেজিত করতে চেয়েছেন। নিঃশব্দে তিনি শুনেছেন। শুনতে শুনতে নিজের কাজ করে গেছেন। আসলে তিনি যে শুনেছেন একথা যেন তিনি স্বীকার করতে চান না। চুপ করে তিনি যে পিসীকে আমল দিতে চান না একথা বোঝাতে ইচ্ছে করেন। কিন্তু পিসী বুঝতে পারছে কিনা এ বিষয়েও তাঁর ঘোর সন্দেহ রয়েছে। তাঁর মৌন ভাব পিসী ছেলের বিয়ের স্বীকৃতি হিসেবে ধরে নিল কিনা তাও তিনি ঠিক ধরতে পারেন না। তবে একথা বুঝে

গিয়েছিলেন — বৌমার বিরুদ্ধে বারবার বলে তিনি যে বিনয়বাবুর মন বিষাক্ত করে দিতে চান তার কারণ পিসীর ধারণা হয়েছে, বিনয়বাবু বৌমা সম্পর্কে তেমন কঠোর নয়। তাই বৌমার বিরুদ্ধে বিষোদগারের এত উদ্যোগ। তবু পিসীর এত বলা যে বিয়ের ভূমিকা একথা বুঝতে পেরেও একেবারে হা-হু-না করাটাকে পিসী ঠিক কিভাবে নিচ্ছে তিনিও তা বুঝতে পারছেন না। দুশ্চিন্তা হত হয়ত ভেবে নিয়েছে, তাঁর নিশ্চল নীরবতার জন্যেই হয়ত ভেবেছে, যা ইচ্ছে কর — আমি এর মধ্যে নেই — এই হচ্ছে বিনয়বাবুর মনোভাব। তবু বার বার বৌমার বিরুদ্ধে বলে কি বিনয়বাবুর ধৈর্যের পরীক্ষা করছেন, বার বার বলে বিনয়বাবুর কাছ থেকে বৌমা সম্বন্ধে মন্তব্য আদায় করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, না, রোজ রোজ বৌমার বাপের বাড়ি যাবার অন্যায়ের কথা বলে বিনয়বাবুকে বৌমার অন্যায় ভুলতে না দেওয়া ও তাকে যে অমান্য করেছে সেই আগুন নিভতে না দেওয়া? কিংবা প্রাণতোষ বাবার মনোভাব পিসীর কাছ থেকে জেনে নিতে চায় বলেই পিসীর এই জেহাদ — এত পরিশ্রম, এত উদ্যোগ। বৌমার বাবাকে বসতে বলবার মধ্যে কি কোন শীতলতা ছিল কিনা তিনি তা মনে করতে পারলেন না। তাঁর মর্যাদাব্যঞ্জক গাম্ভীর্য বৌমার পরিচিত — কিন্তু বৌমার বাবা হয়ত এই গাম্ভীর্যকে শীতল অভ্যর্থনা ভেবে, হয়ত অনেক অপমান সহ্য করতে হবে ভেবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু বিনয়বাবু কি ভাবে এদের অভ্যর্থনা করবেন — কিভাবে এদের সঙ্গে আচরণ করবেন — বৌমাকে ক্ষমা করবার চেয়ে যেন বৌমার বাবার কাছে ছেলের মদ খাবার অপ্রিয় প্রসঙ্গ নিয়ে কিভাবে আলোচনা করবেন তাতেই বিব্রত বোধ করছিলেন। ছেলের মদ খাবার জন্যে যেন নিজেকেও কেমন দোষী মনে হয় — যেন তিনি নিজেও কোন ভাবে দায়ী এরকম একটা অনুভূতি এসে হাজির হয়। গাম্ভীর্যের অন্তরালে যে একটা অপরাধবোধ এসে আশ্রয় চাচ্ছিল তাকে তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিলেন না। বৌমাকে দেখে বাড়ির ঝি-চাকরদের ভিড়ও ঘরের আশেপাশে দেখা যাচ্ছিল। বিনয়বাবু নিজের চাকরকে ডেকে বৌমার জিনিষপত্র বৌমার ঘরে পৌঁছে দিতে বললেন। বৌমাকে ঘরে যেতে বললেন। বৌমা চলে গেলেন।

কুশল প্রার্থনা করে ভদ্রলোক কেবল বলতে শুরু করেছিলেন — এভাবে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে — প্রতিমা যেভাবে চলে গেছে — আমি সেই জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। ভদ্রলোক শেষ করবার আগেই বাধা দিয়ে বিনয়বাবু বললেন — এর আগেও প্রাণতোষ অন্যায় করেছে — হয়ত এখনও করে চলেছে — চলেছে কি চলেছে না — আমি ঠিক জানিনা — তা হলে তো সে জন্যে আমাকেও আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। ভদ্রলোক হা হা করে উঠলেন। বিনয়বাবু আবার শান্তস্বরে বললেন — আপনার মেয়ের ব্যবহারের ওপর যেমন আপনার কোন হাত নেই — প্রাণতোষের আচরণের ওপর আমারও কোন হাত নেই। প্রতিমার বাবা মাথা নাড়তে লাগলেন — দোষ আমার মেয়েরই বেশি — এ আমি বলতে বাধ্য। জামাই

আমার ব্যারিষ্টার — সাহেবসুবোদের সঙ্গে থাকতে হয় — এক আধটুকু। বিনয়বাবু জানালেন — ও কথা ঠিক নয়। সারাজীবন সাহেবদের সঙ্গে কাটালাম — এখনও কাটাচ্ছি। কিন্তু ...। তিনি আর শেষ করেন না। ভদ্রলোক গভীর শ্রদ্ধায় জানান — আপনার সঙ্গে কার তুলনা? ধরতে গেলে আপনি সন্ন্যাসী যোগী। যেভাবে আপনি প্রতিমাকে নিলেন — যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বললেন — আমার মেয়েকে ত্যাগ করলেও আপনাকে সবাই শ্রদ্ধা করত। ভদ্রলোক মাথা নাড়তে থাকেন — কোন ছেলের বাবা মেয়ের বাপের সঙ্গে এভাবে কথা বলা ...... আরো মেয়ের বিয়ে দিয়েছি — বোনের বিয়ে দেখেছি — এ এক আপনার পক্ষেই....। অথচ আমার বোনের শ্বশুরবাড়ী — অন্য মেয়েদের শ্বশুররা ধনে-মানে আপনার পায়ের ধূলোর যোগ্যও নয়। হ্যাঁ, এবার আমি বলে দিয়েছি, যদি আপনার অনুমতি না নিয়ে আমার বাড়ি ঢোকে — তবে, হ্যাঁ, বাড়িতে আমি ঢুকতে দেব না। কথার মাঝেই পিসী এসে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে, বিনয়বাবুর নিজের চাকর জলখাবার ও জল এনে প্রতিমার বাবাকে দিলেন। মিষ্টি সামনে দিতেই বিনয়বাবু বললেন — এবার একটু মিষ্টিমুখ করুন। তিক্ততা এবার শেষ হোক। ভদ্রলোক অভিভূত হলেন। রুমাল বের করে চোখের জল মুছলেন। মিষ্টি একটা তুলে নিয়ে একট পয়সা টেবিলের ওপর রাখলেন। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বাবার ছেলের বাড়িতে খেতে নেই — তাই মিষ্টির দাম হিসেবে ঐ এক পয়সার প্রতীক। মিষ্টি আসতেই পিসী ঘর ছেড়ে চলে যান। পিসীর চলে যাওয়াকে ভদ্রলোক একটু উদ্বিগ্ন হয়ে দেখেন — কিন্তু অপমানিত হন না। ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। বিনয়বাবুও অফিসের কাজ নিয়ে বসলেন।

একটু পরেই পিসীর গলা শুনতে পান — আজ প্রাণতোষের শাশুড়ী থাকলে বৌ এ বাড়িতে ঢুকতে পারত? মা-মরা ছেলে বলে এমন বৌকে ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হয়। মা মরলে বাপ হয় তালুই। আমি তো বাপু বুঝতেই পারছিলাম না। কে ছেলের বাপ আর কে মেয়ের বাপ? মিষ্টি, মিষ্টি খাওয়ানো চাকর দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত — পুরুষ হলে তাই করতো। আমি? আমি কে? ছেলের দূরসম্পর্কের পিসী — লতায়-পাতায় গেছে — টেনে আনাতে ছিঁড়ে গেছে। আমিও যা — একজন দাসীবাদীও তা। বাপ-মা-ছেলে-মেয়ে নেই তবু নিজে আমি আসিনি — একটা পেট — যে কোন বাড়িতে দাসীবৃত্তি করলেও — এ বাড়ির কর্ত্তাতো বিষ্টু — বিষ্টুর ইঙ্গিতেই — এ আমি বুঝিনে? নুন দিয়ে ভাত কাই — শুধু সেই শত্রুর মরবার পর ক'দিন নুন খাইনি — নুন দিয়ে ভাত সকলেই খায়। যাকগে এ বাড়িতে আর নয়। এবার আমি কাশী যাব। গোটাকয় টাকা পাঠিয়ে দিলেও হবে। এ সংসারের জন্যে যদি কিছু করে থাকি — প্রাণকে যদি মানুষ করে থাকি — তবে যেন ক'টা করে টাকা আমাকে কাশী পাঠিয়ে দেয় — না হয় কাশীই পাঠিয়ে দিক — এখনও গতর আছে, দাসীবৃত্তি করে থাকতে পারব। এখানেও করছি — না হয় ওখানে করব। গতর না থাকতে এখানেও কেউ পুছবে না। যতদিন গতর ততদিন আদর। হুঃ,

ছেলের বাপ — চৌদ্দপুরুষের এমন ছেলের বাপ কেউ দেখেনি। চৌদ্দ পুরুষে বৌয়ের এমন দেমাক কেউ দেখেনি! কি ছিল প্রাণের মা — মুখ তুলে কথা কইতে জানত না — মরবার পর কাকপক্ষীতেও কেঁদেছে .... রাগ করে চাকরের সঙ্গে বাপের বাড়ি যাওয়া — এমন দেমাকী মেয়ে মানুষ বাপের জম্মে — ঐ বিষ্টু হারামজাদা....।

সমস্ত ব্যাপারের নায়ক হচ্ছে বিষ্ণু তথা বিষ্টু। বিনয়বাবুর মাস চাকর। বৌরানীর বাড়িতে ছিল তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। ঐ বাড়িতে বিয়ের উদ্যোগ ইত্যাদি সংবাদ সেই নিত্য দিয়ে আসত। প্রতিমার এভাবে চলে আসা বাপের বাড়ির কেউ পছন্দ করেনি। তারপর বিষ্ণুর কাছে খবর পেয়ে বিষ্ণুর পরামর্শমতই মেয়েকে নিয়ে চলে আসেন। ঠিক বিনয়বাবুর মনের অবস্থা টের পেত। তিনি যে প্রতিমার ওপর অপ্রসন্ন ছিলেন না — বিয়ের ব্যাপারে তাঁর যে মত নেই — একথা তিনি না বললেও বিষ্ণু টের পেয়েছিল। বাড়ির লোকও আঁচ করতে পেরেছিল বিষ্ণু প্রাণতোষের শ্বশুড়বাড়ি যায় — অন্যান্য চাকররাও জানত। বিষ্ণুর ভূমিকা গোপন থাকেনি। বৌমার সঙ্গে জিনিসপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। বিষ্ণুই তা প্রতিমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। বৌ-রানীর সঙ্গে সেই তাঁর ঘর পর্যন্ত গিয়েছিল। বৌমাকে ঘরে যেতে বলামাত্র — অন্যান্য চাকর ঝিরাও প্রতিমাকে প্রণাম করে। প্রতিমা ভিতরে চলে যায়। সকলেই আশা করছিল প্রাণতোষ এসে না জানি কি হৈ চৈ করে। কিন্তু প্রাণতোষ এসেও কিছু হল না। যেন পরদিন থেকে প্রাণতোষকে বেশ খোশ মেজাজেই দেখা গেল। পিসিমা ক'দিন প্রতিমার সঙ্গে কথা বলেননি। কাশীও যাননি।

সেই দেশ থেকে সেবার প্রথম চাকরীতে যান — বিষ্ণু সঙ্গে গিয়েছিল। তার পর বিষ্ণুই ছিল ওর নিত্যসহায়। ন'মাসে ছ'মাসে ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখে আসত। একবার বিষ্ণু ছেলেমেয়েদের কলকাতা দেখাতে এনেছিল। মুখে অবশ্য জানিয়েছিল — বাবুকে প্রণাম করতে নিযে এলাম। বিনয়বাবু বিষ্ণুর বৌকে কাপড দিয়েছিলেন — ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনে দিয়েছিলেন। প্রতিমাও নাকি বিষ্ণুর বৌকে শাড়ি দিয়েছিল। শেষ দিকে বিষ্ণুর বাত হয়েছিল — বিনয়বাবু কিছু টাকা পয়সাও দিয়েছিলেন। দেশে কিছু জমিজমাও করেছিল। প্রায় অচল হয়ে দেশে চলে যায়। তারপরও বেশ কিছুকাল বেঁচে ছিল। পূজোর পর বাত নিয়েও এতদূর এসে প্রণাম করে ক'দিন থেকে যেত। শেষ দিকে বড়ো বুড়ো হয়ে পড়েছিল। বিষ্ণু যখন প্রথম চলে যায় — তখন কিছুকাল বিনয়বাবুর ভারী অসুবিধে হত — আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে এসেছিল। তারপর একদিন বিষ্ণুর ছেলের হাতে লেখা পোষ্টকার্ডে বিষ্ণুর মৃত্যুসংবাদ পান। প্রথমেই মনে হয়, মৃত্যু সংবাদ পাবার পর কতদিন পর বিষ্ণুকে মনে পড়ল। সহজেই মৃত্যুসংবাদ তিনি গ্রহণ করলেন। সারাদিন থেকে থেকে বিষ্ণুর চেহারা ক'বার মনে এল। বিষ্ণু এত নিঃশব্দে সেবা করে যেত — তাই ওকে মনে রাখা শক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম যখন দেশের বাড়িতে চিরকালের মত চলে যায় তখন সেবার অভাব যত অনুভব হয়েছিল — বিষ্ণুকে ততটা মনে পড়েনি। সেবার

অভাব কিছুটা মিটে যেতে কিছুটা অভ্যস্ত হতেই বিষ্ণু আর মনে রইল না। বিষ্ণুর কোন ফটোও নেই। বিষ্ণুর মৃত্যুতে কোন দুঃখ বোধ করতে পারেননি বলে প্রথমটা একটু অপরাধবোধ হয়েছিল। কিন্তু অপরাধবোধও মনে থাকল না। প্রাণকে মনে না পড়লে, প্রতিমাকে মনে না পড়লে, প্রাণের সঙ্গে বৌমার ঝগড়ার কথা মনে না এলে, বৌমার রাগ করে বাপের বাড়ি যাবার কথা মনে না এলে — বাবাকে নিয়ে প্রতিমার ফিরে আসবার কথা মনে না এলে — বিষ্ণুকে মনে আসে না। সারাজীবন ধরে বিনয়বাবুর কাছে থাকল — অথচ দু'চারটি ঘটনা যদি কখনও মনে আসে — তখন সেই ঘটনার শেষে বিষ্ণুকে মনে আসে। বিষ্ণুর কথায় তাঁর মনে হয়, যে লোক নিঃশব্দে সেবা করে, নীরবে আত্মদান করে — লোকে অনায়াসে তাঁকে ভুলে যায়। নিজেকে জোর করে জাহির না করলে অপরের মনে জায়গা করে নেওয়া যায় না। অন্তরে যারা ট্রেসপাস করে — মানুষ তাদেরই মনে রাখে। সে জন্যে মানুষ মিত্রকে ভুলে যায়, উপকারীকে মনে করে না — কিন্তু শত্রুকে মানুষ কখনও ভোলে না! বঞ্চক বহু যুগ বাঁচে — মানুষ বঞ্চককে অপকারীর অপরাধকে ভুলতে চায় না — চিরকাল স্মরণীয় করে রাখে — কিন্তু হিতৈষী সল্পায়ু-হিতৈষীকে মনে রাখতে চায় না — পারে না। তিনিও নিঃশব্দে সকলকে সেবা করে গেছেন — তাই তাকেও কারো মনে নেই — শুধু দেখা মাত্র মনে পড়ে — মনে পড়ে জন্মদিনের তামাশার মধ্য দিয়ে যেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের সেই প্রাচীন বটকে দেখবার বিস্ময় নিয়ে সবাই তাকে দেখে — তারপর পিকনিকে মেতে যায়। তিনিও তো তাই। স্ত্রী, পুত্র, বৌমা সকলের মৃত্যুর চেয়ে যেন জন্মদিনের আতংক তাঁর বেশী। আর সকলের মৃত্যুদিনের চেয়ে নিজের জন্মদিন তাঁর কাছে যেন বেশী বেদনার।

প্রাণের পিসীও মরেছে অনেকদিন। প্রাণ বেঁচে থাকতেই। ঐ ঘটনার বছর দুই পর। যখন তিনি কলকাতায় ছিলেন না। কি একটা কাজে পাটনা গিয়েছিলেন। খারাপ রকমের নাকি ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রি হয়েছিল। প্রাণ তাকে হাসপাতালে দিয়ে দেয়। কিন্তু পিসী হাসপাতালে যেতে চায়নি। যখন প্রাণ জোর করে হাসপাতালে পাঠাল তার ধারণা ছিল, হাসপাতালে গেলে নাকি কেউ বাঁচে না। যখন প্রাণ জোর করে হাসপাতালে পাঠাল — তখন তিনি নাকি চিৎকার করে — বিনয়বাবুকে ডাকতে ডাকতে — প্রানতোষকে অভিসম্পাত দিতে দিতে স্ট্রেচারে এম্বুলেন্সে ওঠেন। পরদিন মৃত্যু হয়। বিনয়বাবুর আত্মীয় পরিজনের ধারণা — প্রাণ রোগ শোক সহ্য করতে পারে না বলেই — ঝামেলা নিতে চায়না বলেই হাসপাতালে পাঠিয়েছে। প্রাণের কথা — রোগীদের জন্যে হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েছে — বাড়ির সৃষ্টি হয়নি। যাই হোক, চাকর-বাকর আত্মীয়-স্বজন নিয়ে প্রাণই তাকে দাহ করেছে। তার মরবার পর একটা ফটোও তুলেছিল শ্মশানে। ঐ তাঁর জীবনের মাত্র একটি ফটো। কিন্তু ফটোটি প্রতিমার ঘরে ছিল। কিন্তু আশ্চর্য কিছুকাল পর নামিয়ে রেখে দেয়। কারণ, ফটোটিতে উই ধরেছিল। ফটোটি আর এখন নেই। সুকুমার শর্মিলা কেউ পিসীকে দেখেনি — শুনেছে

কিনা তাইবা কে জানে? ওরা তখন জন্মায়ও নি। পুরানো ঝি চারকরও কেউ নেই। পিসীর অভিসম্পাত, সংসারের জন্যে আজীবন খাটুনী আর খাটুনীর শেষ সিদ্ধান্ত অভিসম্পাতের কেউ আর সাক্ষী নেই। তিনি যে ছিলেন তাই প্রায় সবার অজানা। বিনয়বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিসী চিরকালের মত সংসার থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। ষাট বছরের জীবন একটি জায়গা পাবে না। স্মৃতিও কোথাও পাবে না। কোন স্মৃতির তর্পণও জুটবে না। বিনয়বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পিসীর জীবন ধুয়ে মুছে যাবে। পিসীর নিশ্চিহ্ন হওয়া সম্পূর্ণ হবে।

বৌমার বাবাও মারা গিয়েছেন বেশ কিছুকাল। তবে কবে তা মনে পড়ে না। চেহারাও পরিষ্কার মনে আসে না। বৌমার বাবার মৃত্যুকে বিনয়বাবু নিজের শোকের তালিকাভুক্ত করেননি। এটি ওদের পরিবারের ব্যাপার। বৌমার বাবার মৃত্যু মনে রাখা তিনি অনধিকার প্রবেশের সামিল মনে করতেন। ভদ্রলোক বহুকাল পক্ষাঘাতে অচল হয়েছিলেন। জামাই ও মেয়ের মৃত্যুর শোক পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনদিনও দেখা করতে যাননি। ছেলের মৃত্যুর পর থেকে আর বৌমার মৃত্যুর পর থেকে তিনি ছেলের শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে কিছু মনে রাখতে চাননি — কোন আগ্রহ, কোন সম্পর্ক তিনি মনে প্রাণে চাইতেন না। ওদের ভুলে তিনি শান্তি পেতেন। শেষে মনেও পড়ত না। প্রাণের মৃতুর পর ভদ্রলোক বহুবার এসেছিলেন। কিন্তু বিনয়বাবু বিশেষ আলাপ করেননি। তাঁর ধারণা ভদ্রলোক হয়ত মনে করেছেন, তার মেয়ের কপালে বৈধব্য ছিল তাই তাঁর ছেলেটা অকালে গেল। হয়ত ভদ্রলোক মনে মনে ভেবেছেন, অমন মদ্যপ ছেলের বিয়ে দিয়ে বিনয়বাবু প্রতিমার অকাল বৈধব্য ঘটাল — এ সমস্ত মনে মনে চিন্তা করে নিজেকে দোষী, অপরাধী মনে করছেন সাব্যস্ত করে একটা ক্ষোভ ও অস্ফুট ক্রোধ মনে আসত। তিনি ভারী শীতল হয়ে যেতেন। মনে মনে ভাবতেন, ভদ্রলোকের বোঝা উচিত — তাঁর জামাই গেলেও বিনয়বাবুর ছেলে গেছে — অনেক ফারাক। নিজের শীতলতা ও ঠাণ্ডা ব্যবহারকে বিনয়বাবু মনে করতেন, ভদ্রলোকের ভাবা উচিত — একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তাঁর সামাজিক ক্ষমতা কমে গেছে। চিরকালের অন্তর্মুখীন মানুষ আরো অন্তর্মুখীন হয়ে গেছেন। যতই নিজের অন্তরে প্রবেশ করা যায় ততই আত্মার আলো দেখতে পাওয়া যায় না — নিজের ভেতরের অন্ধকার ততই গভীর ও নিশ্চিদ্র হয়ে দেখা দেয়। চোখ বুজলে কি আর চোখের আলো দেখা যায়? আসলে বিনয়বাবু প্রতিমার বাবার সামনে অস্বস্তি বোধ করতেন — নিজের মুখ দেখাতে কেমন লজ্জা করতো। বিনয়বাবুরই মরবার কথা আগে — অথচ যাঁর বাঁচবার কথা সেই প্রাণ অকালে মরে গিয়ে তাকে অপ্রস্তুত করে দিল। বেঁচে থাকবার লজ্জায় যে তিনি মুখ দেখাতে চাইতেন না — একথা তখনও বিনয়বাবু ভালো করে বুঝতেন না। তাঁর অপ্রস্তুত বেঁচে থাকা যে কি লজ্জার ভদ্রলোকের সামনে একথা অস্ফুটভাবে সমস্ত সত্তায় অস্বস্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি ভারী নীরব হয়ে যেতেন। নিজের ভেতরে আরো ঢুকে যেতেন — সেই বাইরের

অন্ধকার আর ভিতরে চোখ বোঝা অন্ধকার তখন একাকার হয়ে যেত। তখন কুশল বিনিময়ের যন্ত্রণা কি অসীম — একথা কে বোঝে?

বিনয়বাবু আবার একদৃষ্টিতে তাকান স্ত্রীর ফটোর দিকে। এতকাল ধরে ফটোটি দেখছেন — দেখতে দেখতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে যেন ফটো একটা নিষ্প্রাণ ছবিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিটি চোখের সামনে থাকতে থাকতে যেন সমস্ত আকর্ষণও স্মৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। ছবির পেছনে যে একটা জীবন্ত প্রাণের স্মৃতি ছিল — ছবিটি তা ভুলিয়ে দিয়েছে। পুরবলার ছবি পুরবলাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। পুরবালার ছবি দেখলেও এখন পুরবালাকে মনে পড়ে না। ছবি হঠাৎ হঠাৎ দেখতে হয় — সবসময় নয়। অনেকদিন পর পর — চোখের সামনে সকল সময়ের জন্যে নয়। পুরবলার ছবিই ওর জীবনকে আড়াল করে রেখেছে, ঝাপসা করে দিয়েছে। চারদিকে শুধু মৃত-জনের ফটো। এই ঘর — তাঁর একান্ত আপন ঘর — এর এতটুকু অধিকারও হাতছাড়া করতে রাজি নন — তবু এই ঘরটিকে তাঁর মনে হল — যেন কফিনের ফ্রেমে বাধা ঘর — তিনি জীবন্ত থেকে যেন কফিনকে অপমান করছেন। এত মৃত-আপন জনের ফটোর সামনে নিজে বেঁচে থেকে তিনি যেন তাঁদের কাছে — এই মৃত আত্মীযদের কাছে — পর হয়ে গেছেন। জন্মদিনে জীবিত আত্মীয়দের কাছে তিনি যে অনেক অনাবশ্যক — অনেক দুরের মানুষ — তেমনি জন্মদিনে এসব মৃত মানুষদের কাছেও যেন তিনি পর। তিনি মৃত্যুরও কেউ নন — জীবনেরও পর হয়ে গেছেন। তাঁর বিরাট কুঞ্চিত শুভ্র কেশ, উন্নত দেহ — টকটকে রঙ — যৌবনের অনেকখানি চুরি করা সম্পদ নিয়ে তিনি বসে রয়েছেন এমন জায়গায় যেখানে জীবন তাকে স্বীকার করতে চায় না — মৃত্যু পর মনে করে। এই পুরানো যৌবন যেন নতুন রাজত্বে পুরানো কারেন্সি নোট। বাস্তব আর স্মৃতি, পুরনো আর পরিচিত নতুন, মৃত আর জীবিত সব কিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়নি। মৃত ওর কাছে স্পষ্ট আর বাস্তব — যারা জীবিত তারাও তেমনি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র — তবে একটু দূরের। মৃত্যু ও জীবন — দুইই ওর কাছে জীবন্ত। শর্মিলা আর প্রতিমা কেউ অস্পষ্ট নয় — দূরের নয়। তিনি যেমন প্রতিমার থেকে দূরে ছিলেন আজও শর্মিলা থেকে তেমনি দূরে — তা শর্মিলা যত গায়ে পড়াই হোক। মরে গেছে বলে শর্মিলার চেয়ে প্রতিমার বাস্তবতাকে তিনি অবহেলা করতে পারেন না — বিবেকে বাধে — অনুতাপের ভয় হয়।

প্রাণ-প্রতিমা ঝগড়া হত। মিলনও হত। পিসীও প্রাণের পক্ষে — চাকররা কেউ কেউ প্রতিমার দলে। এমনি করেই দিন কাটছিল। বিনয়বাবুও স্ত্রীর মৃত্যুর কথা প্রায় ভুলে এসেছিলেন। পুরবালাকে মনে পড়ত কদাচই। বাবার মৃত্যুর কথাও ভুলে গিয়েছিলেন, মা'র কথাও। তখন তাঁর চাকরী জীবনের শেষ পর্ব-সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা চারদিকে। মৃত্যু সম্পর্কে কেমন যেন অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর দাম্পত্যজীবন তাঁকে মাঝে মধ্যে কেমন উতলা করে দিত — তাও শুধু এক ঝলক। তার ভূমিকাও নেই, পরিশিষ্টও নেই। মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে

যেতেন। সুকুমারের জন্ম হয়েছে। বিরাট অন্নপ্রাশন করেছেন। ছেলের পসার কিছুতেই জমছে না। রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি চলেছে। বাড়িতে নানা দলের লোক। দেশের স্বাধীনতা চাই না জনগণের মুক্তি চাই, কংগ্রেস, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি — নানা লোক, নানা তত্ত্ব। বাড়িতে তর্ক চলে ন্যাশনাল গভর্ণমেন্ট না পিপলস গভর্ণমেন্ট নিয়ে। গ্যালন গ্যালন চা হয়। প্রতিমা ইতিমধ্যে বেশ হৃষ্টপুষ্ট ভারী হয়ে উঠেছে। বিয়ের সময় পাতলা ছিপ ছিপে প্রতিমা — যেমন শান্ত, নিরীহ বলে মনে হত — এক সময় দেখলেন যেমন তেজ তেমনি দৃঢ়। এখন বাড়ির সবাই প্রতিমাকে মান্য করে চলে। বিনয়বাবুর অগোচরে কখন প্রতিমা নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে — তিনি টেরও পাননি। বৌমার চেহারা ভারী হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতরকার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সে ব্যক্তিত্ব অবশ্য অল্প ঘোমটার আড়ালে বিনয়বাবুর কাছে নম্র, বিনত। কিন্তু অন্যত্র শুধু ঘোমটার মধ্য থেকে যে নীরব নির্দেশ বের হত — তাকে কেউ অমান্য করবার সাহসও দেখাত না। বোধ করি, বৌমার কাছে হেরে গিয়ে প্রাণ নির্বাচনে দাঁড়াবার চিন্তা করছে — জনগণের কাছে প্রতিষ্ঠা চাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলীতে কনটেস্ট করবে।

এ সময় পুরবালাকে যত মনে না হত বেশি মনে হত নিজের বিয়ে না করাকে। নিজে যে বিয়ে করেননি — এ প্রশংসা শুনবার একটা আগ্রহ ভিতরে ভিতরে ভারী অনুভব করতেন। স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলে যে তিনি নিজে বিয়ে করেননি — এ আলোচনার রাস্তাটি খুলে দেবেন — তাতেও সংকোচ ছিল। পাছে লোকে বুঝতে পারে সূচনাটি এসেছে উপসংহারটির জন্যে। বিয়ে না করবার জন্যে প্রাপ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হয়ে ভিতরে ভিতরে ভারী বিষন্নতা ও নীরসতায় ক্লান্ত হয়ে উঠতেন। মাঝে মধ্যে উদ্যমও যেন ফুরিয়ে আসত। জোর করে একটা পরিকল্পনা সামনে এনে নিজেকে উত্তেজিত করে কাজ করতেন।

ভেতরে ভেতরে যে একটা নিরস নিরুৎসাহের স্রোত তাঁর অন্তরে বয়ে যাচ্ছে — তিনি অগোচরে তা জানতেন — কাজের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন — সামনে নানা পরিকল্পনা এনে নিজেকে উৎসাহিত করতে চাইতেন। কিন্তু কিছুক্ষণ কাজ চলবার পর কাজটি শেষ করার কোন উৎসাহ পেতেন না — তখন জোর করে জুলুম করে নিজের ওপর অত্যাচার করে কাজটি শেষ করতেন। ক্রোধ বা বিরক্ত হতেন না — কেমন যেন একটা অবশ হবার চেষ্টা — একটা নিশ্চেষ্টতা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছিল। কিন্তু তিনিও আমল দেবেন না স্থির করে ফেলেছিলেন। তবু ঐ নিশ্চেষ্টতার ওপর কেমন একটা লোভ ভেতরে ভেতরে বোধ করতেন।

ছেলের মদ খাওয়া বন্ধ হয়নি। তিনি জানতে পারতেন। প্রতিমা রাগ করে আব বাপের বাড়ি যেত না — তবে কথা বন্ধ করে থাকত। তাঁর মনে হত, ছেলে যে বৌকে গ্রাহ্য করে না — এই ভেতরকার ভয় থেকেই মাঝে মধ্যে মাতাল হয়ে বাড়ি আসত। একদিন, তখন রাত অনেক, টের পেলেন মাতাল হয়ে চাকরদের কাঁধে

ভর করে বাড়ি ঢুকছেন। একটু পরেই—যেন ঘরের বাইরে প্রতিমার গলার স্বর: এই যার চরিত্র তিনি নির্বাচনে দাঁড়াবেন। আদর্শ মানুষ। ভেতর থেকে এবার প্রাণের গলার স্বর ভেসে এল, বেশ স্পষ্ট—যদি ক্ষমতা থাকত—প্রত্যেক ভোটারকে আমি এক বোতল করে রাম প্রেজেন্ট করতাম—যা প্রোগ্রাম তাদের সামনে দিয়েছি—তাতে রামের চেয়ে অনেক বেশী নেশা হবে—আমার জন্যে রাম—ওদের জন্যে মেনুফেস্টো। পুওর ভোটার। চেয়েছিলাম সকলের জন্যেই রাম হোক—এক বোতল করে— অন্ততঃ এক পেগ করে। একটা বেশ মাতাল কনিষ্টিটুয়েন্সি, ওফ্ বিলিতি পত্রিকায় যা কার্টুন বের হত—এটলি পার্লামেন্টে ইণ্ডিযান বিল আনবার সময়.....যখন কনজারভেটিভ পার্টির কোন এম.পি কার্টুনগুলো প্লেস করত....। —আস্তে বাবা জেগে আছেন— প্রতিমার কণ্ঠস্বরে বেশ একটা ধমক। কেন? বাবার ইনসম্নিয়া হযেছে নাকি? আমার মদ খাওয়া নিয়ে মাথা গরম না করে বাবার দিকে একটু নজর তো দিতে পার? এত রাতে জেগে কেন? বাবা ঘুমোচ্ছে বলেই তো এত রাত করে এলাম। টুমরো বাবার জন্যে ডক্টর কনসাল্ট করবে। শোন, বাবাকে —বলো, তাঁর পেয়ারের সাহেব মুরব্বিরা সব চললেন—বিলেত গিয়ে লণ্ড্রী খুলবেন। লজ্জা করে না, বলছি, বাবা জেগে আছেন—বাবার পযসায মদ খেয়ে—ছিঃছিঃ এমন মানুষের এই ছেলে—তোমার নিজেরও ছেলে হয়েছে—এবার যেন প্রতিমার গলায় অভিভাবকের অভিমান। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণেব উত্তর—সারা জীবন সাহেবদের সঙ্গে মিশে বাবা এমন কনজারভেটিভ হন কেন তাই ভাবি? আগে ভাবতাম, বাবার বস্ আর কলিগরা সব কনজারভেটিভ পার্টিব সিমপ্যাথাইজার—কিন্তু ওদের দেশের কনজারভেটিভরাও আমাদের দেশের সোস্যালিস্টদের চেযেও লিবারেল।

ছেলের মদ খাওয়া বিনয়বাবুর অসহ্য ছিল—কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। এ নিযে বাদ প্রতিবাদ করতে রুচিতে বাঁধত—এ নিযে তিরস্কার করলে যেন মদ খাওয়াকে এক রকম স্বীকার করে নেওয়া হয়—ছেলেব লজ্জা ও সংকোচকে কাটিয়ে দেবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। প্রাণের অবাধ্যতাকে স্বীকৃতি দেবার সুযোগ ঘটে। বাবাকে অমান্য করবার সাহস যোগাতে তিনি ভরসা পান না। একটা মাত্র তিরস্কারে প্রাণ পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যাবে—এই আতংক ছিল মনে। অথচ প্রতিমা কি ভাবে? ছেলেকে শাসন করবার জোরটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই। তাঁর নীরব গাম্ভীর্যকে হয়ত দুর্বলতা বলে প্রতিমা ব্যাখ্যা করত। সেই সময় প্রতিমা যখন তাঁর কাছে আসত—তখন চোখে কি অভিযোগ ছিল স্বামীর বিরুদ্ধে—আর শ্বশুরের বিরুদ্ধে অভিমান? আজকাল মুস্কিল হয়েছে এই যে কোন কিছু চিন্তা করলে—কোন স্মৃতিকথা মনে আনতে চাইলে—তা সত্য কিনা ভাবতে গেলে— তাই যেন ছবির আকারে তাঁর মনে হাজির হয়। তিনি যেন এখন অভিযোগে অভিমানে থমথমে প্রতিমার মুখ চোখের সামনে দেখতে পান। প্রতিমাকে সামনে থেকে যেতে দিতে ইচ্ছে হয়

না। যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ যেন বিনয়বাবু তন্ময় হয়ে থাকেন — প্রতিমার চালচলন, সংসার চালনা সব কিছু যেন কেমন জীবন্ত, কিন্তু দূরের। স্পষ্ট, সজীব — কিন্তু মাঝখানে যেন সেই মৃত্যুর ফ্রেমটি আটা যা কিছুতেই খোলা যাবে না। তন্ময় বিনয়বাবু যে প্রতিমার সেই নম্র-কণ্ঠ শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন।

ছেলের মদ খাওয়াকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মদ খাওয়াকে তিনি খারাপ মনে করতেন ঠিকই — তবু, কেমন একটা ঈর্ষা বোধ করতেন। যে নীতি নিয়মকে তিনি এত অভ্রান্ত মনে করতেন — লোকের সমাজের শাসনকে এত অলঙ্ঘনীয় মনে করতেন — মানুষের কাছে নিজেকে বঞ্চিত করে আদর্শ হওয়াকে এত বরণীয় মনে করতেন — উল্টোটাকে সমাজ দারুণ ঘৃণা করবে প্রত্যাশা করতেন — এই বদ্ধমূল ধারণা এতকাল তাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। আর নিজের ছেলে, সমাজ, মানুষের শ্রদ্ধা, আদর্শ হবার আকাঙ্ক্ষাকে অনায়াসে অগ্রাহ্য করল — উপেক্ষা করল। অথচ সমাজ তা মেনে নিল। অথচ সমাজ, নীতি, নিয়মকে উপেক্ষা করবার, অগ্রাহ্য করবার কথা তাঁর মাথাতেও আসেনি। যে বিবেক, পাপবোধ, অপরাধবোধকে তিনি এত ভয় করতেন — ছেলে অবলীলাক্রমে প্রচণ্ড প্রাণের আবেগে তা ভাসিয়ে দিল। যে নিয়ম, নীতি, বিবেকের অত্যাচার তিলে তিলে বছরে বছরে সহ্য করে এসেছেন — প্রাণ তাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ায় তার ভারী ক্ষোভ হত। মনে হত — সমাজের নীতি নিয়মকে, নিজের পাপবোধকে এতখানি গুরুত্ব দিয়ে তিনি ঠকে গেছেন — বঞ্চিত হয়েছেন। অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছেন। ছেলের ওপর ঈর্ষা হত — ওর প্রচণ্ডতা ও প্রবলতাকে উদ্দাম ও অসংযম বলে নিন্দে করে তৃপ্তি পেতেন না। সমাজের ওপর ক্ষোভ হত — যেন একটা স্থায়ীত্বের মুখোশ পরে তাকে প্রাণশক্তিহীন করে দিয়েছে। একটা অস্থিরতা নিজের ভেতরে ভেতরে বোধ করতেন আরোও বেশি করে যখন ভেতরে ভেতরে প্রায় নিজের আগোচরে বুঝতেন, এখন আর নিজেকে পরিবর্তন করবার শক্তি নেই, জোর নেই। তখন কাজকর্ম বিস্বাদ লাগত — সমস্ত উৎসাহ নিভু নিভু হয়ে আসত — নিজের সামনে নানা লোভনীয় কাজের প্রোগ্রাম রেখেও নিজেকে উৎসাহিত করতে ভারী চেষ্টা ও কষ্ট করতে হত। কাজ শেষ করা কঠিন হয়ে যেত। নিশ্চেষ্টতা ও নিস্ক্রিয়তার ওপর ভারী লোভ জাগত। একা একা চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে জাগত। ইচ্ছে জাগত চুপচাপ বসে পুরবালার মৃত্যুর জন্যে পুরবালাকে দায়ী করেন। পুরবালার অস্পষ্ট স্মৃতিকে ক্রোধের আশ্রয় করবার জন্যে একদৃষ্টিতে পুরবালার ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কিন্তু পুরবালার ফটোর পেছনে পুরবালা ঝাপসা হয়ে গেছে। পুরবালার ফটো পুরবালাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। নিজের এই নিস্ক্রিয়তার ওপর লোভ — অতি অল্প কাজেই একটা শ্রান্তি, সামান্য পরিশ্রমে অবসাদ — আর শ্রান্তি ও অবসাদ আসবার জন্যে একটা আকর্ষণ ও লোভ, রাতে মাঝে মাঝে অনিদ্রা — আর অনিদ্রার ওপর দারুণ ভয় — সব মিলে একটা অদ্ভুত চাপা অস্থিরতা, গোপন চঞ্চলতা তাকে নিজের জন্যে উদ্বিগ্ন

করে তুলত। অফিসের কাজ, বাড়ির কাজ সব কিছুর ওপর যেন টান চলে গেছে — এসেছে তীব্র বিতৃষ্ণা। এ সময় তিনি দীক্ষা নেবার কথাও ভেবেছেন। গুরুর খোঁজও অলসভাবে করেছেন। দীক্ষা ও গুরুরকথা ভেবে নিজেকে একটু সক্রিয় করতে চেয়েছেন — নতুন জীবন পাবার একটা প্রোগ্রাম সামনে রেখে নিজেকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু যে শান্তির জন্যে দীক্ষা ও গুরুর কথা ভেবেছিলেন — কিছুদিন পর সেই দীক্ষা ও গুরুর অন্বেষণও তাকে আর আকর্ষণ করতে পারল না। এই চিন্তার নতুনত্বও একদিন নিজের ভেতরেই সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলল। কুলগুরু ছিলেন। তিনি একদা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেবেন — তাও একসময় স্থির ছিল প্রায়। কিন্তু তিনি মত বদলালেন। যে সমাজ তাঁর বেলায় ন্যায়, নীতি, বিবেকের পরাকাষ্ঠা — ছেলের বেলায় নীরব অক্ষম দর্শক — সেই সমাজের ওপর তিনি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছিলেন ভেতরে ভেতরে। কুলগুরুকে প্রত্যাখ্যানেব ভেতর দিয়ে যেন তিনি সমাজের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। অবশ্য কুলগুরুকে হঠানো অত সহজ হয়নি — তিনি বার বার এসেছেন — থেকেছেন — নিবস্ত হতে চাননি। প্রাণের কাছেও গেছেন বাপ-ছেলে-বৌমাকে একসঙ্গে দীক্ষা দেবেন বলে। প্রাণ গভীর রাতে চিৎকার করে বলেছে — ওরে বাবা, এই কুলগুরুগুলো দেখছি — পার্টির ক্যাডারদের মত — ধরলে আর ছাড়তে চায় না। বিলেতে রজনী পাম ডাট্ আর হ্যারি প্যালিট্ এমনি ক্যাডার লেলিয়ে দিয়েছিল আমার পেছনে — হুইস্কিব মত পেছনে লেগে থাকত।

তবু ছেলের এই মাতাল হওয়া, এই বৌমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে ঝগড়া — আর নিজের দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও পথ করে কেমন একটা অভিমান হত — বাবা-মার ওপর। মেজ ভাইয়ের বৌকে বড় বৌয়ের মর্যাদা দেওয়ার চিন্তার মধ্যে। তিনি সংসারের বাইরে থাকতেন বলে — বাইরের মনে করতেন সবাই — এ কথা তখন মনে হত। মনে হত — তিনি বরাবরই ছিলেন সংসারের আপনজন নয়, আদরের নয় — কেবল গর্বের। তিনি সংসারের অলংকার ছিলেন — অঙ্গ ছিলেন না।

ছেলের এই স্বাধীন জীবনযাপন — এই ভ্রুক্ষেপহীন যথেচ্ছাচার — অবশ্য কিছুই তাঁর চোখের সামনে নয় — তবু, ছেলের সামনে — প্রবল ভ্রুক্ষেপহীন সব কিছু অগ্রাহ্য করবার জন্যে যে প্রাণশক্তি প্রকাশ পেত — সেই তুলনায় নিজেকে কেমন কাপুরুষ, নিষ্প্রাণ, দুর্বল মনে হত। আবার ছেলেব এই ব্যবহারে কেমন ঘৃণাও ধরত — ছেলের স্বাধীনতায় ঈর্ষা ও জ্বালা তাকে কেমন একটা নীরব ছটফটানি এনে দিত। নিজের বাধ্য স্বভাবের জন্যে যেন জীবন থেকে বঞ্চিত হয়েছে — নিজের ট্রাডিশনকে মেনে চলবার জন্যে যেন একটা আত্মধিক্কারও দেখা দিত। আবার কেমন একটা অশ্রদ্ধা পাবার অপমানও বোধ করতেন — নিজের প্রাপ্য না পাবার অভিযোগও ছিল মনে মনে। কেবল মনে হত সেই সময়, তিনি বাবা-মাকে যেমন শ্রদ্ধা

করেছেন — ছেলের কাছ থেকে তা পাচ্ছেন না। তিনি যেন পিতৃত্বের পাওনা থেকে বঞ্চিত। তিনিও ছেলেকে এড়িয়ে চলেন — ছেলেও তাকে এড়িয়ে চলে। তবু, এত দুঃখে মনে হত তাঁর শরীরের খবরাখবর নেবার জন্যে ছেলে প্রতিমাকে নির্দেশ দিচ্ছে! হযত লজ্জায় কাছে আসে না। তিনি চান — ছেলে অন্ততঃ একটু কাছে ঘোরাফিরি করুক — আবার ছেলের সামনে তিনি কি ব্যবহার করবেন তাও ছিল তার সমস্যা — তাই ছেলে এল না বলে দুঃখ করতেন, স্বস্তিবোধও হত।

সংসারের জন্যে বেশি চিন্তা করছেন বলে নিজেকে ধিক্কার দিতেন। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনাও দিতেন — আমাদের অল্পায়ুর বংশ — ঠাকুর্দা, বাবা, এমন কি মা-ও অল্প বযেসেই গেছেন। আমিই কি আর বেশিদিন বাঁচব! সবার কাছেই বলতেন, তাঁব বংশের ধারা দেখে ও নিজের সহজাত বোধ থেকেই তিনি আগাম জানেন — তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। বাঁচতে পারেন না। কথার খেলাপ করে আজও তিনি বেঁচে। কথা রাখতে না পারবার জন্যে আজ তিনি মুখ দেখাতে পারেন না। সবাই যে মরবার কথা দিযেও মরলেন না। ওযার্ড অব অনারের কোন মূল্যই তিনি দিলেন না। তবে, ভাগ্যের পরিহাস, যাদের কথা দিয়েছিলেন — তারাও কেউ জীবিত নেই।

প্রতিমার একবার খুব অসুখ করে — প্রাণ ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ঘন ঘন ডাক্তার আসতে থাকে। প্রাণ শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায। হাইকোর্টে যাওয়াও ছেড়ে দিল। রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরও বিদায় দিয়ে দিল পত্রপাঠ। ছেলের শুকনো মুখ — মুখ কাচুমাচু করে ঘুরে বেড়ান — একদিনও মদ না খাওয়া — ওর এই অশোভন উৎকণ্ঠা দেখে বিনয়বাবুর ভাবী খারাপ লাগে। ছেলেকে নিলর্জ্জ ও স্ত্রৈণ বলে মনে হয়। নিজেও সবসময় খবরাখবর করেছেন। ছেলের উৎকণ্ঠায় অভ্যস্ত হয়ে এক এক সময় তাঁর মনে কেমন একটা অনুতাপ ও অপরাধবোধ সূঁচের মত আঘাত করত। অন্তরে রক্তক্ষরণের বেদনা বোধ করতেন। বিনয়বাবুর মনে হত, নিজের স্ত্রীর অসুখের সময় এ রকম উদ্বিগ্ন না হয়ে, উৎকণ্ঠিত না থেকে — নিজের স্ত্রীর ওপর অবিচার করেছেন — তাঁর উদ্বিগ্ন হওয়াতে স্ত্রীর যে ন্যায্য অধিকার ছিল — তাঁর কাছ থেকে স্ত্রীর যে ন্যায্য উৎকণ্ঠা প্রাপ্য ছিল — তিনি নিরুদ্বিগ্ন থেকে সেই অধিকার থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করেছেন। যদিও দু'একবার মাত্রই স্ত্রীর অসুখ করেছিল দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে — তখন স্ত্রী যে আছে একথা স্বীকার করাই ছিল কষ্টকর। সময ছিল অন্যরকম। আর শেষ অসুখের খবর তিনি পাননি। দু'পয়সা না এক পয়সার পোষ্টকার্ডে মৃত্যুর সংবাদটি পেয়েছিলেন। তবু স্ত্রীর অসুখে নিরুদ্বিগ্ন থাকায় ওর স্মৃতির কাছে কেমন অপরাধবোধ হত। ফটোর দিকে তাকাতে সংকোচ হত। এসময় যেন ফটোটি জীবন্ত হয়ে, নীরবে ভৎর্সনা ও অভিমানে ছলছল করত। ভয় করত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও, বার বার জীবনে এই প্রথমবার কেবল মনে হচ্ছিল, পুরবালার শেষ সময় পুরবালা কি ওকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়নি? কিন্তু তা তো প্রকাশ করবার উপায় ছিল না। পুরবালা কতদিন ভুগেছে — কই, কেউ একটা সংবাদ দেবারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

আর দিলেই কি তিনি আসতেন — এলে, লোকে কি বলবে — এই ভয়ে হয়ত পুরবালা কেমন আছে — তাও লিখতে পারতেন না। তবু পুরবালাকেও কি একটা চিঠি লিখতে পারতেন না ? নিজের মর্যাদা — নিজে স্ত্রৈণ নন — একথা প্রমাণ করতে গিয়ে নিজেকে ঠকিয়েছেন — পুরবালাকে অবহেলা করেছেন। ছেলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পেয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করেন পুরবালার ঝাপসা স্মৃতির কাছে। তখন মনে হয়, তিনি পরিবারের আদর্শ ছেলে হতে গিয়ে পুরবালার ভালবাসাকে ও নিজের ভালবাসাকে অপমান করেছেন। নিজের ন্যায্য ভালবাসাকে পরিবারের হাতে বলি দিয়েছেন। পুরবালাকে তিনি ডাকেননি — হয়ত অপেক্ষা করে ছিল — যেমন, তিনি দূর থেকেই টের পান, প্রতিমা প্রাণের পায়ের শব্দের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। স্ত্রীর অভিমান, শাসন, স্নেহ, প্রেম-পুরবালার মধ্যেও এসব মাধুর্য ছিল — তা অনাবিষ্কৃতই থেকে গেল। হয়ত পুরবালাও তাঁর পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে টাইফয়েডের জ্বরের মধ্যে অপেক্ষা করে থাকত — আর তিনি দু'পয়সা না এক পয়সার কার্ডের শুধু বাবার সাধু ভাষায় লেখা বৌমার মৃত্যু সংবাদ শুনেছিলেন। যেন কিছুই হয়নি — একটা মানুষের মৃত্যু কিছু নয় — তাঁর স্নায়ু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যেই যেন পুরবালার মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। এই নির্বোধ আত্মত্যাগ, এই আদর্শ হবার মূঢ় আকাঙ্ক্ষা...... সকলের ঠুনকো প্রশংসার অতিলোভে তিনি দেবতা হতে গিয়েছিলেন। ছেলেটা অমানুষ — তবু ওর মধ্যে ভালবাসা আছে — তিনি দেবতা — জড়বস্তু, কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। দেবতা হয়েছেন বটে — তবে দেবতাও তো অমানুষই।

সেই সময় নানা ভাবনা তাকে কেমন অস্থির করে তুলত। অফিসের ডেস্কেও প্রাণ-প্রতিমার সংসার এসে হাজির হত। এতকাল তিনি বাড়িতে অফিসকে নিয়ে গেছেন — এখন যেন প্রতিশোধ হিসেবে বাড়ি এসে অফিসের ডেস্কে হাজির হয়েছে। নিজের অলক্ষ্যে তিনি যে সংসারে থেকেও ত্যাগী পুরুষ ছিলেন — এবার যেন এই অভিমানটিও যেতে বসল। নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণার ভিত্তি যেন খসে যেতে লাগল। সংসারে জড়িয়ে পড়বার অস্বস্তি যেন তাকে পেয়ে বসত। কখনও কখনও ভাবতেন, এই অসুখে বৌমার যদি মৃত্যু ঘটে — ভগবান না করুন — তবে ছেলেকে বিয়ে দেবেন না। ওর মদ খাওয়া, নানা রকম দোষ — তারপর মাঝে রাজনীতি নিয়ে মেতেছিল — বৌমার অসুখে ভাটা পড়েছে কতকটা। মোট কথা তিনি মত দেবেন না। জেনে শুনে আরেকটা মেয়ের সর্বনাশ তিনি করতে পারেন না। তবে যা ছেলে — ভরসার কিছু নেই। বৌমা বেঁচে থাকতেই বিয়ে করতে চায় — হয়ত শ্মশান থেকে ফিরে আসাটুকুও সবুর সইবে না। যদি তাকে অগ্রাহ্য করেও বিয়ে করে তবে তিনি সম্পত্তি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে দান করে যাবেন। নয়ত নিজেই সংসার ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকবেন। দেখি, ছেলে কি করে সংসার চালায়। যাই হোক, বৌমা শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে গেল। সংসারের শ্রী ফিরল। ছেলে আবার মদ খেয়ে মাঝে মধ্যে এসে গভীর রাতে চিৎকার করে জানাত — ঠিকমত টনিক খাবে — আবার যেন অসুখ না হয়। মেয়ে মানুষদের

এই অসুখ বিসুখ করা আমি একদম সহ্য করতে পারিনা — এগমিক্সচার খাবে। কাঁচা ডিমের কুসুমের সঙ্গে ক'ফোটা ব্র্যাণ্ডি — তাহলে বাড়িতেও একটা বোতল থাকে। খাওনা — ক'দিনে চেহারা যা খুলবে...। প্রতিমা বেঁচে যাওয়াতে বিনয়বাবু নিশ্চিন্ত হন ঠিকই — তবু ছেলেকে ঈর্ষে হয় — ওর ভাগ্য ভাল। কই পুরবালা তো বাঁচল না?

প্রাণের আয় ছিল সামান্য। কেস প্রায় পেতই না। কিন্তু তাড়াহুড়া করে ঘড়ি দেখতে দেখতে অতি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে হাইকোর্ট রওনা হত। আয় যা হত — তাতে মদের খরচ দূরে থাক — পকেট খরচও চলত কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া একটা লোকের নিজেরই কত খরচ আছে। তাই বা জোটে কোথা থেকে। অথচ ছেলে কখনও বাপের কাছেও ঘেষবে না। অথচ না এলেও যে চলে না। তখন প্রাণ প্রতিমার শরণাপন্ন হত।

সমস্ত সংসারের খরচই বিনয়বাবু দিতেন। প্রতিমার হাতে সংসারের জন্যে থোক টাকা একসঙ্গে দিয়ে দিতেন। তা থেকে গোপনে টাকা দিয়েও যখন কুলাতো না — তখন প্রাণের তাগাদায় তাগাদায় অস্থির হয়ে লজ্জায় সংঙ্কোচে এতটুকু হয়ে বার বার প্রতিমা প্রাণের জন্যে টাকা নিতে আসত। প্রবল সংকোচে, অল্প ঘোমটার আড়াল থেকে স্বামীর উড়নচণ্ডী স্বভাবের নিন্দে করে শেষে পরোক্ষে টাকার উল্লেখ করত। তিনি বিনা দ্বিধায় টাকা দিয়ে দিতেন। কিন্তু কেমন একটা শূন্যতা ও বেদনা বোধ করতেন। একটা ভাষাহীন অভাবে যেন অন্তরটা টনটন করে উঠত। ছেলে সোজাসোজি টাকা চাইতে আসে না। সেজন্যে নয়। বরং ছেলে যে আসতে সাহস পায় না এতে তিনি স্বস্তিবোধই করেন। নিজের খরচ নিজে চালাতে পারে না — এতেও ছেলের ওপর রাগ হয়না — মাঝে মধ্যে দুশ্চিন্তা হয় মাত্র। প্রতিমা টাকা চাচ্ছে প্রাণের জন্যে — লজ্জা-সঙ্কোচ — হয়ত কিছুটা অপমান — অপরাধবোধ নিয়েও — এর মধ্যে তিনি এক ধরনের অদ্ভুত মাধুর্যবোধ করতেন। স্বামীর উড়নচণ্ডী স্বভাবের পরোক্ষ উল্লেখের মধ্যে বিরক্তি ও ক্ষোভের চেয়ে যেন বিরক্তি ও ক্ষোভের ছদ্মবেশে একটা সস্নেহ-কৌতুকই যেন ফুটে উঠত — দুষ্টু ছেলের দুষ্টামির উল্লেখে মা'র মুখে যে ছদ্ম-বিরক্তির অন্তরালে একটা প্রশ্রয়ের স্নেহ ফুটে ওঠে — অনেকটা যেন সেই রকম। স্বামীর এত অন্যায়, অত্যাচার, সত্ত্বেও — আর সেই জন্যে লজ্জায় এতটুকু হয়ে টাকা চাইতে আসবার সময় স্বামীর জন্যে ওর চোখে মুখে যে প্রশ্রয়ের স্নেহ ফুটে ওঠে-স্বামীর টাকা জোগাড়ের জন্যে হেয় হবার মধ্যে এত মাধুর্য ও সৌন্দর্য থাকতে পারে — বিনয়বাবু জীবনেও তা অনুভব করেননি। একটা শূন্যতার বেদনায় উদাস মনে যেন যন্ত্রের মত ড্রয়ার খুলে নিঃশব্দে টাকা বের করে দিতেন। তারপর কতক্ষণ যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন — তা ঠিক নেই।

মাঝে মধ্যে একটা অস্থির বিরক্তি তাঁকে চঞ্চল করে তুলত। কেন প্রাণ বৌমাকে টাকা চাইতে পাঠায়? নিজে আসতে ভয় পায়? যদি না পায়? তিনি যদি কঠোর হন? এত নিয়েছে যে 'না' বললে প্রাণের বলবার কিছু নেই — এ ভয়ে আসে না? নিজে চাইতে এলে যদি বাবা দু'কথা বলেন? কিংবা বাবার মুখোমুখি হবার সাহস নেই?

কোন কথা চিন্তা করেই তিনি মনকে শান্ত করতে পারেন না। ছেলেকে মুখের ওপর না বলতে তিনি পারবেন কিনা সন্দেহ। বরং ছেলে নিজে আসে না বলে তিনি অনেকটা নিষ্কৃতিই বোধ করেন। পরের মেয়ে বলে বৌমার বেলায় তিনি কঠোর হতে পারবেন না, প্রাণ কি এই ভেবে প্রতিমাকে পাঠায়? একথা চিন্তা কবে তিনি যেন আবো অস্থির হয়ে ওঠেন। অনেক সময় ভাবেন, বৌমাকে টাকা না দিয়ে প্রমাণ করে দেবেন — পরের মেয়ের বেলাও তিনি কঠোর হতে পারেন। তিনি জানেন তা সম্ভব নয়। নিজের ছেলের বেলায় যিনি কঠোর হতে পারেন না — পরের মেয়ের বেলায় তিনি কি করে কঠোর হবেন। একথা কি লোকে বোঝেন না? অথচ টাকার কিছুটা যে মদের পেছনে যায় তা কি তিনি জানেন না? — অথচ তিনি তো শাসন করছেনই না — পরন্তু পরোক্ষে টাকা দিচ্ছেন। মদ খেলে টাকা দিতে আর পারবেন না — একথা তিনি কিছুতেই যেন বলতে পারেন না। যেন তাতে তিনি ছেলের মদ খাওয়াকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। জেনেও না জানার ভানের মধ্যে তিনি একরকম আছেন — বাড়ির লোক হয়ত জানে — কর্তাবাবু খেয়াল করেন না। কিন্তু ছেলের মদের প্রসঙ্গ তুললে — টাকা বন্ধ করতে হবে। তাকে আরো আরো কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু টাকা না দিয়ে চুপ থাকতে পারবেন না। সবচেয়ে বড় ভয়, প্রাণের মদ খাবার কথা তিনি নিজ মুখে বললে প্রাণের সংকোচ, সমীহভাব চলে যাবে। তখন হয়ত তাকে অগ্রাহ্য করেই মদ খাবে। তখন তিনি পারবেন ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে? একটা বড় অশান্তিকে ডেকে আনতে হয়। ছেলে যদি বাড়ি থেকে না চলে যায় — তবে তিনি কি করতে পারেন? কিছুই পারেন না। বড় জোর — তাকেই চলে যেতে হয়। কিন্তু সে মেয়েলী রাগ — প্রাণের পিসী যেমন মাঝে মধ্যে রাগ করে আসেপাশে কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে দু'দিন থেকে আসে — তারপর এসে জানায় — তিনি যাবেন কেন? কেন তাকে দেশ থেকে আনা হল — তিনি নিজের ইচ্ছায় কি এসেছেন — তার কি ভাত জুটছিল না? তিনি তেমনি করে পিসিমার ব্যবহার নকল করবার কথা ভাবতেই পারেন না। অবশ্য তিনি গেলে এদের না খেয়ে মরতে হবে — সে দিক থেকে তাঁর যাওয়া এদের পক্ষে একটা শাস্তি তো নিশ্চয়ই। তবু এমন রাগ করে চলে যাবার মধ্যে যে মেয়েলী ধরনের অমর্যাদা ও অতি নাটকীয়তা রয়েছে — তাঁর সমস্ত শিক্ষিত অন্তঃকরণ ও রুচি এ ভাবনায় বিদ্রোহ করে ওঠে।

হঠাৎ মন যেন একটা ছবিতে আটকে যায়। একটা উদাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক চিরে বের হয়। আজ যেন তিনি অনেকটা স্বস্তির সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। বৌমার সেই সঙ্কোচ — টাকা চাইবার জন্যে লজ্জায় মরিয়া ভাবটুকু বিনয়বাবুর ভালই লাগত। এই মুহূর্তটুকুর জন্যে যেন তিনি অপেক্ষা করে থাকতেন। অথচ মুহূর্তটুকু এলে তিনি ভালো করে চাইবার আগেই টাকা দিয়ে বৌমাকে পাঠিয়ে দিয়ে স্বস্তি লাভ করতেন। সেই মুহূর্তটির মুখোমুখী হবার আকর্ষণ ছিল — সাহস ছিল না। আজ তিনি অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে বৌমার সেই চেহারাকে নিরাপদে শান্তিতে অনুভব করলেন। যতক্ষণ স্মৃতিটুকু

থাকল — থাকতে দিলেন — জোর করে বিদায়ও দিলেন না — আবার চলে গেলে ধরেও রাখলেন না — ফিরে মনে আনবার চেষ্টাও করলেন না।..... স্ত্রীর ফটোর দিকে তাকালেন। না, প্রতিমার চেয়ে পুরবালাই সুন্দরী ছিল। এখন শালীও বেঁচে নেই। তবু তাঁর চুল পেকেছিল। কত মোটা হয়েছিল। দু'বোনের চেহারায় মিলও ছিল। পুরবালা বেঁচে থাকলে এমনিই হত। অনেক অনেক দূরে পুরবালা। ফটো না দেখলে মনে আনাই শক্ত। স্মৃতি অস্পষ্ট, ধূসর, ঝাপসা। প্রতিমাও মোটা হয়ে গিয়েছিল — শেষের দিকে। না, প্রতিমাকে স্পষ্টই মনে আছে, মনেও পড়ে, পুরবালার মত চেহারা খুঁজতে হয় না।

সকলেই শ্মশানে গেছে তরুণ থেকে — কালো চুল, দৃঢ় দাঁত, সুস্থ সবল তারুণ্য নিয়ে। পুরবালা তরুণই থেকে গেছে চিরকাল, বিষণ্ণ বৌমাও তারুণ্যের লাবণ্য নিয়েই শ্মশানে গিয়েছিলেন — আর প্রাণ? যখন ওকে সাজিয়ে চন্দনের ফোটায় মুখ আচ্ছন্ন করে — গরদের পাঞ্জাবী ও আদ্দির ধূতি পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হল — তখন মনে হল যেন — বিয়ের আগে — বাসরে যাবার একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন — ঐ প্রচণ্ড কান্নাকাটির মধ্যেও মনে হয়েছিল — প্রাণ আরেকবার বর সাজতে চেয়েছিল কিছুকাল আগেই। আজ ওর বরের পোষাক, ফুলের মালা, এসেন্সের গন্ধ। শ্মশানে শালগ্রাম সাক্ষী রেখে মরণের কাছে যজ্ঞ করছে। তিনি পাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছু কিছু তদারকীও করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে কলকাতা হাইকোর্ট বন্ধ হয়ে যায়। গাড়ীতে গাড়ীতে বাড়ি ছেয়ে গিয়েছিল। ব্যারিস্টার, এডভোকেট, রাজনৈতিক নেতাদের নীরব ভীড়ে বাড়ি ছাপিয়ে বাইরেও উপচে পড়ছিল। প্রাণও তরুণ — যেন সদ্য বিয়ে করতে যাচ্ছে — এমনি প্রসন্ন মুখে শ্মশানে গিয়েছিল।

আজ একটা জোর করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে চাইলেন। কিন্তু দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল না। সেদিন তিনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে প্রাণকে দেখেছিলেন। জীবনে কোনদিন এতক্ষণ ছেলেকে দেখেননি। সমস্ত জীবনেই ছেলের সঙ্গে দু'পাঁচ মিনিটের বেশী দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। দেখা হলে দু'জনেই অস্বস্তিবোধ করতেন। যখন ছেলে প্রথম তাঁর কর্মক্ষেত্রে গিয়েছিল — তখনও ছেলে খুব কমই কাছে আসত। এলে যেন তিনিও স্বস্তি পেতেন না। কি রকম ব্যবহার করতে হবে — এই অনিশ্চয়তাই কি অস্বস্তির কারণ? না, তিনিও তাঁর বাবার সঙ্গে ঠিক এই রকম ব্যবহার করে এসেছিলেন — পেয়ে এসেছিলেন। অর্থাৎ বাবার কাছ থেকে দূরে থাকতে হয় — শুধু নির্দেশ মেনে চলতে হয়। ছেলে কাছে এলে তাই নির্দিষ্ট ব্যবহারসূচীর অভাবে তিনি কি অসহায় বোধ করতেন? আর প্রাণ? হয়ত পিতা আপনজন-গুরুজন কিন্তু খুব দূরের লোক। তাই ছেলে কাছে যখন আসত — তখন অনেকটা দূরে একা একা আসবার ভয় বোধ করত। সেদিন মৃত ছেলের চেহারার মধ্যে যেন পুরবালার আভাস ফুটে উঠেছিল। সেই পুরবালা, যার ফটো না দেখলে মনে পড়ত না — সেই যেন নিজের চেহারা দিয়ে মৃতছেলেকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। হয়ত মা'র কাছে যাবার সময় মা'র মত হয়ে উঠেছিল। তখনও প্রতিমা

পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল — ওর দিদিমা পাঁচ বছরের সুকুমারকে ধরে রেখেছিল। কেমন কাঁদ কাঁদ মুখে বিহ্বল হয়ে মা'কে বাবাকে সকলকে দেখছিল। তখন প্রতিমাকে দেখে মনে হয়েছিল — কেমন একটা আশ্বাসের মত মনে বার বার উঁকি দিয়েও স্থায়ী হতে পারেনি — রেখাপাত করতে পারেনি — তা হচ্ছে, ওর এবারকার দুঃখে অন্ততঃ একজন শরীক আছে। মনে এসেছিল — সুকুমার যেমন পিতৃহারা, তেমনি প্রাণও একদিন মাতৃহারা হয়েছিল।

প্রাণের স্বাস্থ্য তো খারাপ ছিল না। একটু ভারীও হতে শুরু করছিল। হঠাৎ একদিন জ্বর হল। ডাক্তার এল। দু'চারদিনের পরই জানলেন ম্যারেনজাইটিস। শুনেই বুক শুকিয়ে যায়। তাঁর বুক শুকিয়ে গেলেও ভিতর থেকে কেমন একটা বিশ্বাস ছিল। প্রাণ বাঁচবেই। সেই ভরসাকে তিনি দারুণ ভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। বড় ডাক্তার আর কেউ বাদ ছিল না। কিন্তু আটদিনের দিন বেলা এগারটার সময়.....। শেষদিকে কিছুটা শুকিয়ে গিয়েছিল- -শুকিয়ে বেশ তরুণ হয়ে গিয়েছিল। বাইরের ভারিক্কী ভাবটি চলে যেতেই ভেতরে ভেতরে ও যেন মা'র মত, মা'র দলে, সেই কথাই ধরা পড়ে গেল। ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে যেতেই তিনি নিজের ঘরে এলেন। কিন্তু সঙ্গে এল, এক গাদা বুড়ো মানুষ। প্রতিমার বাবা, পাড়ার বয়স্ক, প্রবীন ব্যক্তিরা। এদের কথা অসহ্য মনে হচ্ছিল, সঙ্গ বিরক্তিকর তবু একা হতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। একলা নিজের এই সময়কার মনের মুখোমুখি হতে যেন সাহস পাচ্ছিলেন না।

আজ বিনয়বাবুর হঠাৎ খেয়াল হয়: কোনও দিন তিনি ভাল ভাবে প্রাণের অসুখ-মৃত্যু সব কিছু বিস্তারিত করে পরিষ্কার করে ভাবতে সাহস পাননি। মনে উঠলেই তাড়াতাড়ি সেরে নিয়েছেন। আজ মনে হয় অত তাড়াতাড়ি করবার আর দরকার নেই। ভাবতে গেলে যতটা বিচলিত হবেন বলে ধরে নিয়েছেন — অতটা বিচলিত হবেন এই ভাবনাটাও একটা অভ্যাস মাত্র। আজ যেন নিরুদ্বেগে নিজের একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কথা চিন্তা করা যায়। অনুভূতির সমুদ্র থেকে স্মৃতি থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। স্মৃতির শুকনো পাড়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু মনে করা যায়। মনে না করবার এতদিনকার অভ্যাসটাই যা বড় বাধা।

ছেলে আছে, পড়ছে, বিলেত গেছে, বিয়ে করেছে, ব্যারিস্টারী করেছে — সবই তাঁর চেতনায় ছিল। অথচ ছেলে কত কম এসেছে-কতটুকু তিনি ছেলেকে দেখেছেন। মৃত্যুর পরে মৃত ছেলের দিকে যতক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন — সারাজীবনে ততক্ষণ ছেলের দিকে কখনো তাকিয়ে থাকেননি। অতখানি নিঃসঙ্কোচে ছেলেকে দেখেননি। ঐ একবার মাত্রই পরিষ্কার ছেলেকে দেখেছেন — যেখানে ছেলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে নেই — তিনি অন্য দিকে তাকিয়ে ছেলের কথার উত্তর দিচ্ছেন বা প্রশ্ন করছেন ভাববাচ্যে। দু'এক সময় হঠাৎ হঠাৎ তাঁর মনে হয়েছে, ছেলের জন্যে শোক করা — একি একটা প্রথা, অভ্যাস, নিছক সামাজিক কুসংস্কার — যখন তা অনেকদিন হয়ে যায়! তিনি দেখেছেন, অপরের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা নেবার জন্যে নয়ত নিছক সহানুভূতির

জন্যেও ছেলের শোককে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তিনি অবশ্য ছেলের মৃত্যুর কথা পারতপক্ষে বলেন না — ছেলের স্মৃতির অমর্যাদা তো বটেই — আসলে, মৃত ব্যক্তির কথা বললে নিজে বেঁচে থাকবার কৈফিয়েৎ দেবার সঙ্কোচেই গলা যেন বন্ধ হয়ে আসতে চায়। আজকাল মাঝে মধ্যে যখন প্রাণের মৃত্যুর কথা মনে আসে যা তিনি কোন মতে পাশ কাটিয়ে আবার ভেতরে পাঠিয়ে দেন — তখন ভাবেন নিজের ভাবী মৃত্যুর কথা। তিনি যে মরবেন — এই অনিবার্য সত্য যে ঘটবেই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হতে চায় না। তাঁর মনে হয়, তাঁকে যারা জন্মদিনে দেখে তাঁরা আব বিশ্বাস করে না তিনি মরবেন। তবু তিনি মরবেন। শুধু কামনা, জন্মদিনে যারা আসে তাদের আগেই যেন যান। তিনি যে মরতে পারেন — অপরের মৃত্যুর নিছক দর্শকমাত্র নন — একথা যেন তারা জেনে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়, অল্প বয়সে, প্রৌঢ় বয়সে মৃত্যু এলে — আত্মীয়স্বজন কি প্রবল শোক করে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে তেমন করে শোক করবার কেউ নেই। সবাই শান্ত ভাবে মেনে নেবে — সবাই বলবে, বেশ গেছে। একটা শান্ত বিষাদ হয়ত শ্মশান বৈরাগ্যের চেয়েও অল্পায়ু হবে। শ্রাদ্ধ পর্যন্ত লোকে মনে রাখবে — তারপর? হয়ত ছ'মাসের মধ্যে তাঁর কথা সবাই ভুলে যাবে। অল্প বয়সে মরলে তিনি অনেক শোক পেতেন — অনেককাল লোকের মনে দীর্ঘনিঃশ্বাসে বেদনায় বেঁচে থাকতে পারতেন। তপ্ত স্মৃতিতে আশ্রয় পেতেন। এতকাল বেঁচে তিনি স্মৃতিতে থাকবার অধিকার নষ্ট করেছেন। জোর করে এতদিন বেঁচে তিনি অশ্রুজলের পাওনার দাবী নষ্ট করেছেন। বিনয়বাবু সসঙ্কোচে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। একটা দাবী হীন ও অধিকারহীন কুণ্ঠিত অভিমান বোধ করেন। জগতটা ছোট হতে হতে এই একটা ঘরে এসে আটকে গেছে। সবাই যেন এই তাঁর তৈরী করা বাড়ির একটা ঘরও তাকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। এই ঘর থেকে শ্মশানে — এই পথটুকুর জন্যে সবাই কেমন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ঘরটাতে লোকের লোভ নেই। লোকে নিষ্কামভাবে নিস্বার্থভাবেই তাঁর মৃত্যু চায়। তাঁর এতদিন বেঁচে থাকবার বিস্ময় যেন মানুষ আর সহ্য করতে রাজী নয়।

জীবন তাকে পর করতে শুরু করেছে আজকে থেকে নয়। বোধ নয় কোনদিনও জীবনের ঘনিষ্ঠতা পেলেন না। জীবন ঘনিষ্ঠ হল না — পর হয়ে থাকল চিরকাল। তবু যখন থেকে চুল পাকতে শুরু করল — বোধহয় চল্লিশের গোড়ার দিকে মাথায় প্রচুর কালো ঘন কুঞ্চিত কেশের মধ্যে দু'চারটি সাদা রূপোর টান। তখন থেকেই যেন জীবন যে শিথিল হয়ে যাচ্ছে, সংসারের বৈঠক খানার অতিথি হতে শুরু করেছেন — এমন একটা ধারণা তাঁকে আশ্রয় করতে থাকে। রাস্তায় যখন যেতেন তখন মনে হত তিনি যেন জীবনের বাঁদিকে চলছেন না — ডানদিকে যাচ্ছেন। ট্রাফিকের নিয়ম যেন তাঁর বিপরীতে। তরুণ, নবীন, যুবকদের সম্প্রদায় তাকে দলছাড়া করে দিল। যৌবন ও জীবন এবার থেকে তাকে অতিরিক্ত — হয়ত প্রয়োজনীয় কিন্তু আপন নয় বলে মনে করে। পাকা চুলের মধ্য দিয়ে জীবনের বিমুখ হয়ে যাওয়া তিনি বোধ করতেন। তরুণ, তরুণীদের দিকে তাকিয়ে মনে হত জীবন যেন তাকে ছেড়ে ওদের

দলে যোগ দিয়েছে। কত তরুণ তাঁরই চোখের সামনে বুড়িয়ে গেল — তবু জীবন কখনো আপন হয়নি, ঘনিষ্ঠ হয়নি, দলত্যাগ করে তরুণদের দলে মিশেছে — একজন তরুণকে ছেড়ে তাঁর পরবর্তী জেনারেশনে গেছে — তবু এতকাল বেঁচে, এতকাল জীবনের সঙ্গে রক্তে, স্নায়ুতেও বেদনায় কাটিয়ে জীবনের মন পেলেন না। তরুণ, নবীন, প্রৌঢ় কখনই তিনি কারো অন্তরঙ্গ হননি। তবু, চুল পাকাবার পর থেকে তাঁর কেবল মনে হত — ওরা যুবক তরুণরা তাঁকে নিজের দলের লোক ভাবেনা। যৌবন তাকে আপন আসরে আর নেবে না। আর এতকাল বেঁচেও তিনি যেন জীবনের পরবাসী হয়ে রইলেন। জীবনের এত পরিচর্যা সত্ত্বেও অতিথির কুণ্ঠা তাঁর সমস্ত সত্তায়। প্রবাসীর মত সমস্ত জীবন কাটালেন। সে সময় — সেই যৌবনের প্রান্তে প্রায়ই বলতেন, জীবন তো শেষ করে এনেছি। প্রচুর প্রতিবাদ শুনে তৃপ্তি পেতেন। ওদের প্রতিবাদই — হয়ত তা নিছক মৌখিকই — হয়ত ওদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন করুণভাবে সত্য হল — ওরা তা জানে না। অনেকে জানল না। যেই ছেলের চুল এক গোছাও পাকেনি — যে জীবনের স্বাদ কানায় কানায় ভোগ করছিল — তিনি নিজের পাকাচুল নিয়ে — জীবনে থেকেও প্রবাসী হয়ে — সেই পুত্রের শ্রাদ্ধের বন্দোবস্ত করলেন।.... যারা বেঁচেছিল — পুরবালা মধ্যরাতে প্রদীপের আলোতে হয়ত এক ফোটা তাঁর কাছে এসেছিল — দিনের বেলা কোন স্মৃতিই নেই — হয়ত দিনের বেলা দেখেছেন কিনা কে জানে? প্রাণকে মৃত্যুর পরেই বেশি সময় বেশীক্ষণ ধরে দেখেছেন। এদের বেঁচে থাকাটা ঘটেছে অন্যের সঙ্গে — শুধু শোকটি তাঁর জন্যে। শুধু প্রতিমারই তাঁর কাছে এসেছে বেশি — তাই হয়ত প্রতিমার শোক তেমন করে.....। প্রতিমার কোন ফটো তাঁর ঘরে নেই। প্রতিমার কথা ভাবলেন — ওর চেহারা সহজেই মনে এল। সেই শান্ত, লজ্জিত, নম্র, কুণ্ঠিত। চেহারা মনে এলেই তিনি এতদিন অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতেন। আজ যেন নিশ্চিন্তে-নিরাপদে-নিরুদ্বেগে প্রতিমার কথা ভাবলেন। প্রতিমার চেহারা মনে এল — থাকলও কিছুক্ষণ — আজ যেন তিনি নিঃসংকোচে প্রতিমার চেহারাব দিকে মনে মনে একমনে তাকিয়ে রইলেন।

বিনযবাবু আবার প্রাণের মৃত্যুর কথায় মন দেন। সত্যি, কোনদিন ওর অসুখ আর মৃত্যুর কথা ভালো করে চিন্তা করেননি। এ কথা আজ দুবারই মনে এল। একথা ভাবা যেন তিনি কর্তব্য মনে করলেন — মৃত পুত্রের শাস্ত্রকৃত্যের মতই যেন একটা অবশ্য কর্তব্য। এতকাল যা তিনি অতি সংক্ষেপে পাশ কাটিয়েছেন। যেন প্রাণকে বঞ্চিত করেছেন। কারণ ছিল বইকি, সেই সময়কার — সেই অসুখের সময়কার — উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা — স্মৃতিতেও অসহ্য।

তাছাড়া কষ্টকর স্মৃতিকে তখনই ভালো করে স্মরণ করা যায় যখন সুদিন আসে। দুঃখের দিনকে রয়ে সয়ে উপভোগ করা যায় যখন সুখের দিন আসে। স্মৃতি যখন বেদনা জাগায় না — দুঃখ ও শোক যখন উৎস থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেবল বয়েই চলে, তখন সেই বেদনার শুরুর দিনটির কথা কোন নিষ্কৃতি দেয় না। প্রাণের

মৃত্যুর আগেকার দিনগুলোর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ও পরের শূন্যতা কী অসহ্য! এতো দুঃখের দিনের কথাকে সুখের দিনে বসে আরামে বিলাসে উপভোগ করবার নয়। মৃত ছেলের — তাও একমাত্র সন্তানের মৃত্যু — যেন অযুত আলোকবর্ষ জুড়ে যে অন্ধকার রয়েছে — যেখানে কোন নক্ষত্রের একবিন্দু আলোও নেই — সেই মহাকাশের মহান্ধকারের শূন্যতা যেন বাবার বুকে রয়েছে — তাঁর পক্ষে রয়ে সয়ে ছেলের মৃত্যুর খুটিনাটি চিত্র তৈরী করা যেন একটা নিষ্ঠুর চেষ্টা। তবু তিনি অস্বীকার করতে পারেন না শোকের তীব্রতা কমে এসেছে, ব্যথার ও গ্লানির চাপ হালকা হয়েছে — শূন্যতার নিঃশব্দ হাঁহাকার চেতনা থেকে আস্তে আস্তে সাময়িক ভাবে হলেও আত্মগোপন করেছে। সেই অযুত আলোকবর্ষ জুড়ে যে নিশ্চিদ্র অন্ধকার বুকে চেপে ছিল — সেই অন্ধকার অনেক হালকা হয়ে গেছে — সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের ওজন অনেক কমে গেছে। সেই শূন্যতার বোঝা আর গুরুভার নয়। সব জিনিসটা এখন সহ্য করা যায়। বিনয়বাবুও একদিন কেমন শান্ত, আরো স্তিমিত হয়ে যান। শুধু ছেলের কথা — ছেলের নাম উচ্চারণ করতে কেমন লজ্জা পান — ছেলে যেন মরে গিয়ে তাঁর কাছে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবু, ছেলের বাৎসরিক করবার সময় নিজের ভেতরের শান্তভাব তাকে কেমন একটা আত্মগ্লানি ও অপরাধবোধ এনে দিত। শোক কমে আসবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হতেন — নিজে প্রায় নিজের অগোচরেই ধিক্কার দিতেন — নিজের বাইরের শান্ত ও স্থির ভাবটি মনেও অভিযান করছে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন। শেষ পর্যন্ত মানুষের শোক করবার ক্ষমতা সম্পর্কেই হতাশ হয়ে শান্তিলাভ করতেন। আরো ভাবতেন, সবার জন্যে শোক করবার জন্যে তিনি জন্মেছেন — তাঁর মৃত্যুর জন্যে যারা শোক করবে তারা সবাই মরে গেছেন। নিজেকে সেই সময় মনে হত — অন্তরে কান্নার সমুদ্র — বাইরে মরুভূমির শুষ্কতা। ভয় হত — হয়ত মরুভূমি সমুদ্রকে গ্রাস করবে — নয়ত সমুদ্র মরুভূমিকে। কিন্তু কিছুই হল না। সমুদ্রও শান্ত হল — মরুভূমিতেও রাত নামল। আসলে তাঁর বাইরেকার মরুভূমি তা দিনই হোক — বা রাতই হোক — সেই তাপে সেই শুষ্কতায় তাঁর মৃত্যুর জন্যে কেউ চোখের জল ফেলবে না।

যাই হোক, মানুষ শোক চায় না বলেই একদিন শোককে ভুলে যায় একথা স্মরণ করে তিনি নিজেকে ও সংসারকে ধিক্কার দিতেন। আর শোককে লালন করে তিনি যে পুত্রশোকে কাতর এমন একটা অহংকারও যেন তিনি নিজের মধ্যে লক্ষ্য করলেন। বুঝলেন, শোককে ভুলে যাওয়া ও শোককে মনে করে রাখা দুয়ের মধ্যেই আত্মপ্রবঞ্চনা রয়েছে। এ চিন্তায় তিনি যে খুব শান্তি পেয়েছিলেন — তা নয়। হঠাৎ হঠাৎ মনে হত — মিউজিয়ামের মমীটা যদি বেঁচে উঠত — কেমন অপরিচিত মনে হত পৃথিবীকে, দর্শকদের, কিউরেটারদের। হয়ত দু'দিনে অভ্যস্ত হতেন — কিন্তু কেউ তাঁর আপন হত না। নিজেকে যেন মমীর জায়গায় বসিয়ে দিতেন। কল্পনাটি পীড়া দিত — কিন্তু কেমন আকর্ষণও ছিল। নিজের পুরানো পরিচিত আপন পৃথিবী এমন আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় — খেয়ালও হয় না — তখন মমীর ক'দিন বেঁচে থাকবার মত অভ্যস্ত হয় — আপন হয় না।

আবার প্রতিমার চেহারা ভেসে ওঠে। ওর বৈধব্যের চেহারাই ভেসে ভেসে আসে। উঃ, সেই প্রাণের মৃত্যুর পর কিছুকাল। ওর দিকে তাকাতে পারতেন না। ওর সেই নির্মম সাদাশাড়ী — কালোপাড়ের সাদা শাড়ী — ওর শূন্য কপাল ও রিক্ত সিঁথি — এই দেখবার জন্যে তিনি বেঁচে আছেন — রইলেন — গ্লানিতে অন্তর যেন বিষের ব্যথার মত হয়ে উঠত — একটু স্পর্শেই যেন সমস্ত সত্তা আর্তনাদ করে উঠত।

শুধু কি তাই। প্রাণের মৃত্যুর পর যতই দিন যেতে লাগল — একটা বিশ্রী লজ্জা, একটা পীড়ন-করা সঙ্কোচ যেন বিনয়বাবুকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল। ছেলের মৃত্যুর পর এই প্রৌঢ়-জীবনের মধ্যাহ্নে তাঁর এই প্রৌঢ় মুখকে তরুণ পুত্রবধূর কাছে দেখাতে লজ্জা করত ভয়ঙ্কর ভাবে। সেই সঙ্গে একটা অপরাধ বোধ — যেন প্রতিমাকে পুত্রবধূ করে এনে তিনি বিধবা করে দিলেন। উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে শান্ত করতে গিয়ে যেন একটা মেয়ের জীবনকে নষ্ট করে দিলেন। যদিও ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বড় মনে আসত না — আর উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে ছেলে মরেনি — তবু, এই জন্যে যেন একটা লজ্জা — একটা অপরাধবোধ — যেন ছেলেকে বাঁচাতে পারলেন না অথচ নিজের দিব্যি বেঁচে রইলেন। এই অপ্রস্তুত বেঁচে থাকার সঙ্কোচ ও গ্লানিতে যেন এতটুকু হয়ে যেতেন। ঘর থেকে একদম বের হতেন না। প্রতিমার সামনে কিভাবে সহজ হবেন — এই সমস্যা তাকে বিচলিত করে ফেলত। মনে প্রাণে প্রতিমার অনুপস্থিতি কামনা করতেন। প্রতিমা ক'দিন বাপের বাড়ি গেলে তিনি যেন স্বস্তি বোধ করতেন। মনে হত — প্রতিমাকে বিধবা করে দেবার অপরাধবোধে যেন প্রাণকে ভালো ভাবে স্মরণ করতে পারছেন না। অথচ আবার প্রতিমা বাড়ি না থাকলে — এমন একটা ফাঁকা শূন্যতায় — অবসাদ মনকে অধিকার করত। তখন কেমন মনে হত — যদিও সেই মনে হওয়াকে তিনি চেতনায় বড় প্রশ্রয় বা প্রবেশ দিতেন না — প্রতিমার জন্যে অপরাধবোধের মধ্যে যেন আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করা যায়। লজ্জা ও অপরাধবোধের মধ্যে এমন একটা নীরব উত্তেজনা — এমন শোককে ভুলবার — এড়াবার শক্তি আছে — যা প্রতিমাকে বাড়ি না থাকলে — অবসাদে, শূন্যতায়, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে।

একটা নীরব লাঞ্ছনা, নীরব ধিক্কার যে প্রতিমাকে এ বাড়িতে অহরহ সহ্য করতে হত — তাও কি অগোচর ছিল? সব সময় তা যে নীরব থাকত — গোপন থাকত — অতটা সভ্যতা ও শোভনতা যে আমাদের সংসারের পক্ষে — সহ্যশক্তির পক্ষে সম্ভব নয় — তাও তার অজানা ছিল? অনেক বাঁকা মন্তব্য, অনেক মর্মভেদী তীক্ষ্ণ-অভিযোগ যে প্রতিমার কপালে প্রায় দৈনন্দিন ছিল — তাও কি তিনি জানতেন না? কেউ জানাত — বরাবরই নাকি লক্ষ্য করেছে, প্রতিমার চেহারার মধ্যে নাকি বিধবা বিধবা ভাব রয়েছে — এটা নাকি ভগবানের সতর্কবাণী। কেউ বলত — বৈধব্য যোগ রয়েছে নিশ্চয়ই — নইলে অমন তাজা ছেলেকে খাবে কেন? কারো দৃঢ় বিশ্বাস — নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ — আর প্রাণের নির্ঘাত নরগণ তাই.... । কেউ কেউ আরো একধাপ এগিয়ে আবিষ্কার করত — প্রতিমার বাপ ধড়িবাজ। জাল ঠিকুজী তৈরী করে

প্রাণের সঙ্গে মিল করিয়ে নিয়ে এমন অলক্ষুণে মেয়ে গছিয়ে.....। কারো আফশোষ: যদি প্রাণ আর একটা বিয়ে করত — হয়ত সেই ভাগ্যে বেঁচে যেতে পারত। যদি একটা মেম বিয়ে করে আনতিস রে প্রাণ — এমন করে তোকে হারাতাম না।

প্রতিমার কানে সবই যেত। তিনি কেমন করে যেন বুঝতেন, লজ্জায়, অপমানে, সঙ্কোচে প্রতিমাও তাঁর কাছে মুখ দেখাতে চাইতো না। এতে তিনি কেমন স্বস্তিবোধও করতেন। তিনি যে একাই লজ্জিত নন — একথা বুঝতে পেরে — একরকম করে অনুভব করে তিনি এক ধরনের আশ্বাস পেতেন। আর সকলে শোককে অভিযোগে পরিণত করে হাল্কা করতে চাইছিল। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। হয় শোককে মৃত ব্যক্তির অজস্র গুণগানে লঘু করে অনুভব করা — শোকের পীড়নকে সহ্য করতে না পেরে স্তুতিবাদের প্রলাপে প্রশংসার উচ্ছ্বাসে লঘু করে এক ধরনের নিষ্কৃতি পাওয়া — এমনকি লঘুভাবে আনন্দও পাওয়া — মানুষের — দুর্বল ও সত্যের মুখোমুখী হতে সাহস না পাওয়া অধিকাংশ মানুষের স্বভাব। তাই প্রতিমার সঙ্গে এক ধরনের নিজের মিল তাকে আশ্বস্ত করত। তবু, তিনি ভাবতেন, এই মিল অনুভব করে প্রাণের শোককে — শোকের তীব্রতাকে কম করে দেখা — এও কি আত্মপ্রবঞ্চনা নয়? এও কি শোককে সাময়িকভাবে শান্ত করবার চেষ্টা নয়। নিজের অফুরন্ত বোঝার মত শূন্যতা থেকে অন্যমনস্ক হতে পারার এটা কি একটা চেষ্টা নয়? তবু প্রতিমার পায়ে শব্দ শুনলে সমস্ত অন্তঃকরণ অপরাধবোধে, সঙ্কোচে যেন এতটুকু হয়ে যেত। যে স্বামী বাঁচল না — যাঁর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে নিজেকে ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠল।

অথচ আর এক ধরনের ঈর্ষার জন্যেও নিজের লজ্জা কম হত না। নিজেকে সেখানেও ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠত। প্রতিমা যে শুধু আত্মীয় স্বজনের কাছে বাঁকা মন্তব্য, গোপন ও পরোক্ষ ধিক্কারই পেত তা নয় — সহানুভূতির ঢেউও যেন আর শেষ হতে চাইত না। প্রতিমার জন্যে ক্রমাগত অপরকে দুঃখ করতে দেখতে দেখতে তিনি কেমন একটা ঈর্ষার জ্বালাও অনুভব করতেন। তিনিও ঐ প্রতিমার বয়েসেই পুরবালাকে হারিয়েছিলেন, কই, কেউ তো তাকে এমন করে সান্ত্বনা দিতে আসেননি। এমন করে তার জন্যে সহানুভূতি জানায়নি। যেন পুরবালার মৃত্যু ছিল নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। পুরবালার মৃত্যু যেন গায়ে মাখবার মত জরুরী ছিল না। তাছাড়াও, প্রায়ই না লক্ষ্য করে পারতেন না, লোকে প্রতিমার শোক ও শূন্যতাকে যত বড় করে দেখছে — গুরুত্ব দিচ্ছে — তাঁর পুত্র শোককে ঠিক সেই পরিমাণে মর্যাদা দিচ্ছে না। তাঁর সামনে যে সান্ত্বনা দিচ্ছে — তা যেন নিতান্তই নিষ্প্রাণ মৌখিক প্রথার আবৃত্তি মাত্র। প্রথমেই যা তাঁর মনে হত তা হচ্ছে, যেন প্রাণের মৃত্যুর বেদনার চেয়ে প্রতিমার ক্ষতিই লোকের চোখে বেশি করে পড়ছে। এতে প্রাণের অভাবকে লোকে যত মূল্য দিচ্ছে তার চেয়ে বেশি দিচ্ছে প্রতিমার বৈধব্যকে। এতে তিনি এক ধরনের ঈর্ষা অনুভব করতেন। নিজের বাড়ির লোকও যেন প্রাণের জন্যে শোক করবার চেয়ে প্রাণের শোককে উপলক্ষ্য করে প্রতিমাকে দোষ দিতেই ব্যস্ত। দুদলই যে প্রাণকে নয় — প্রতিমাকেই লক্ষ্য করছে।

তাঁর পুত্রশোককে গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিমার বৈধব্যকে লোকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে — সেই জন্যে যে এক ধরনের ঈর্ষা মনে আসত — এই ঈর্ষা যে তিনি পরিষ্কার করে ভাবতেন তা নয় — ভাবতেন, তাঁর ব্যথা তাঁর নিঃসঙ্গ শূন্যতাকে কে বুঝবে — কে বুঝতে চাইবে? প্রতিমার ছেলে রয়েছে — ওর তো অবলম্বন রয়েছে। আর আমার? লোকের আন্তরিক সহানুভূতি প্রতিমার দিকে যাওয়ায় তিনি যেন একটা বঞ্চনার বেদনা — অবহেলার ক্ষোভ অনুভব করতেন। এমনকি যারা যারা তাঁর সামনে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে আসতেন — মনে হত — যেন সান্ত্বনার চেয়ে পুত্রশোকে তিনি কি রকম আচরণ করেন — এই কৌতূহলই প্রচ্ছন্ন। পুত্রশোকের প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে কেমন — যেন এরকম একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যেও কেউ কেউ তাঁর কাছে এসে বসত। এদের এই অসভ্য কৌতূহল ও অভব্য রকমের অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি আরো পীড়িত হতেন। অথচ কেউ এসে যদি দেখা না করে চলে যেত — তবে মনে হত তখন, যেন তাকে অপরাধী ভেবে চলে গেল। যেন প্রতিমাকে বিধবা করবার জন্যে তাকে দায়ী করে চলে গেল। কিংবা কেউ যদি জানাত — তাঁর সামনে দাঁড়াবার মুখ নেই। — তখন তিনি মনে করতেন — যেন তাঁর শোককে বাড়িয়ে দেখছে। তিনি আবার আত্মগ্লানিবোধ করতেন। আর প্রায়ই ভাবতেন, এই ঈর্ষা, আত্মগ্লানি, বঞ্চনার বেদনা এগুলোর জন্যে কি তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন? পুত্রশোকের দুঃসহ শূন্যতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে? অথচ দুটোই পীড়ন — দুটোই কম বেদনাদায়ক নয়। অথচ....। আত্মসমালোচনা কি আত্মপীড়নের জন্যে? ছেলের মৃত্যুতে কি তিনি নিজেকে শাস্তি দিতে চান? ওর শোকই কি যথেষ্ট শাস্তি নয়? শোকের তীব্রতা কমে গেলে আত্মগ্লানি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে? তিনি কি শোককে লালন করতে চান? শোককে বিনাসে পরিণত করতে তাঁর ইচ্ছে? এই শোককে কি তিনি ভোগ করতে চান কেবল? আত্মজিজ্ঞাসাও কি আত্মপীড়ন? নিজের বিপর্যস্ত মনে নিজের সমালোচনা করতে নেই। এই চিন্তাটিও কি নিজেকে এড়াবার — নিজের মুখোমুখী না হবার আত্মপ্রতারণা মাত্র? শেষ পর্যন্ত নিজের ভাবনাগুলোতে কেমন তাঁর অরুচি ধরে যায়। অরুচি এত ভেতর থেকে আসে যে তিনি আর এই অরুচিকে আত্মবঞ্চনার ছদ্মবেশ বলে ভাববার জোর পেলেন না।

প্রতিমাকে এসময়ে এমন শুকনো শুকনো লাগত! অনেকসময় তার কেমন বিরক্তিকরও মনে হত। মনে হত — যেন একটা শোকের বিজ্ঞাপন চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে। ওর চেয়ে বেশি অভাব — শূন্যতা তো কারো হয়নি। তবু নিজেকে স্থির কি তিনি রাখতে পারেননি! কেমন মনে হত — তাঁর শোক থেকে দৃষ্টি ঝেড়ে নেবার জন্যে প্রতিমার এই নিজেকে শুকিয়ে ফেলা — শুকনো হয়ে থাকা — শুকনো হয়ে যাবার চেষ্টা।.... অনেক পরে মনে হত কই, পুরবালার মৃত্যুর পর তাঁর তো তেমন কিছু হয়নি। কিছুই যে হয়নি — একথা জানানই তো ছিল তার প্রধান চেষ্টা। কত পার্থক্য পুরুষে আর নারীতে! সত্যি কথা বলতে কি, প্রাণের মৃত্যুর পর তাঁর নিজেরও

প্রতিমাকে দেখে — শূন্য সিঁথি-রিক্তললাট — খালি হাত — সাদা শাড়ী — ছেলের অকাল মৃত্যুর বীভৎসতা যেন অনেক বেশি চিৎকার করে উঠত। প্রতিমার শুকনো চেহারার সঙ্গে যেন একটা নীরব আর্তনাদ নিবিড় হয়ে ছিল। তাই যতবার প্রতিমাকে দেখতেন — ছেলের চেয়ে ছেলের মৃত্যুই যেন বড় হয়ে দেখা দিত। ছেলের নানা কথা মনে করবার মধ্যে তবু সজল স্মৃতি শান্তি না দিক, স্বস্তি না দিক, এক ধরনের বিস্তৃতি দেয়। কিন্তু প্রতিমা যেন প্রাণের মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে চলে। ওকে দেখলেই শুধু শোকের কথাই মনে আসে — প্রাণের কথা মনে আসে না। প্রাণ ছিল একথার চেয়ে প্রাণ নেই — এই কথাই যেন ওর সমস্ত চেহারায় গোঙাতে থাকে। তাই প্রাণের মৃত্যুর কিছু পরে যখন বাচ্চা সুকুমারকে নিয়ে প্রতিমা বাপের বাড়ি গেল — তখন প্রতি মুহূর্তে প্রতিমাকে দেখে প্রাণের মৃত্যুর কথা প্রতিবার মনে পড়বার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি যেন আশ্বস্তই হলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বাড়িঘর কেমন শূন্য মনে হতে থাকে। মনে হয়, এই শূন্যতার নিঃস্বতার ভার যেন অসহ্য। যেন এর ভারে দমবন্ধ হয়ে আসে। শূন্যতার বোঝা যেন চেপে ধরছে। ছেলের অসুখ, মৃত্যু, শোক — একের পর এক এই যে উত্তেজনা — প্রতিমা বাপের বাড়ি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন শেষ হয়ে যায়। এতদিন শোক, বিষাদ, বিতৃষ্ণা বিষণ্নতা ছিল — এখন যেন কেমন সব রিক্ত, নিঃশেষ ও নিস্তেজ। আনন্দকে জীবনে প্রশ্রয় দেননি — প্রসন্ন ছিলেন। একদিন প্রসন্নতার জায়গায় উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, মৃত্যু, শোক-এল। এরাও গেল। প্রসন্নতাও ফিরে এল না। জীবনের সব অবলম্বন যেন চলে গেল। জীবন যেন একেবারে ফাঁকা। ধূ-ধূ করতে থাকে। আশা নেই। নিরাশার হতাশাও যেন নেই। তিনি যেন একেবারে খালি হয়ে যান। যেন জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে — অথচ ঘুম নেই — ঘুমোবার লোভ নেই।

কিছুদিন পর আবার ছেলেকে নিয়ে প্রতিমা এল। প্রতিমাকে দেখে তিনি যেন একটা দুঃসহ শূন্যতা থেকে মাটি দেখতে পেলেন। এতদিন প্রাণকে, প্রতিমাকে সুকুমারকে কাউকে অনুভব করবার কোন শক্তি তাঁর ছিল না। মন যেন পক্ষাঘাতে অসাড়। অসাড়তার অক্ষমতায় সমস্ত জগত যেন ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। কিছুই যেন ঠিক অনুভব করতে পারছেন না। অথচ অনুভব না করবার যন্ত্রণা, কিছু একটা করবার জন্যে আর্তনাদ, কিছু একটা ধরবার পিপাসায় যেন ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রতিমাকে দেখে প্রাণের অভাবকে স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে বুঝলেন, শোককে মনে পড়ল, নিজের নিঃস্বতার একটা স্বরূপ বুঝতে পেরে যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। প্রতিমাকে দেখে যেন তিনি নিজেকে ঝাপসা বালির ঝড় থেকে রক্ষা করলেন। রাত দুপুরে ছেলের সেই মাতলামো — প্রতিমার চাপা ক্ষোভ — এগুলোর জন্য এখন আর অপেক্ষা করতে হয় না — তবু প্রতিমা বাড়ি থাকলে — প্রতিমার সঙ্গে যেন কেমন করে এক হয়ে মাঝরাতের মাতলামীর জন্যে একটা অবুঝ প্রত্যাশায় — একটা স্মৃতিতে এক হওয়া যায়। প্রাণের অভাবকে যেন ঘটনা দিয়ে অনুভব করা যায়।

প্রাণের মৃত্যু আরেকটি ক্ষতি করে গেছে। এতকালের গোছানো মনকে শুধু এলোমেলো নয়, অগোছালো করে দেওয়া নয়, কেমন যেন উল্টেপাল্টে দিশেহারা করে দিয়েছে। নিজেকে যেন আর চেনা যায় না। বাইরের মানুষ তাঁকে যত স্পষ্ট চিনতে পারে — তিনি যেন ঠিক অতটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেকে চিনতে পারছিলেন না। কেমন যেন একটা ভয় জাগানো অপরিচিত মানুষ তাঁর মধ্যে বাসা নিয়েছে। তাকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। ঠিক এই বিনয়বাবুকে তিনি চেনেন না — এই মানুষটি যে পর — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। নিজেকে — নিজের পুরানো গোছানো বিনয়বাবুকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। নিজের পুরানো চেহারাকে ভালবাসেন বলে নয়, নিজের পর হয়ে যাওয়াকে ভয় করেন বলেই শুধু নয় — নিজের পুরানো ঘনিষ্ঠ পরিচিত বিনয়বাবুর ওপর তিনি অনেক বেশি নির্ভর করতে পারেন বলেই নিজেকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন — উন্মুখ হয়ে থাকেন কখন আস্তে আস্তে তিনি আবার নিজের পরিচিত গলার স্বর, নিজের পায়ের শব্দ শুনতে পাবেন — শোনবার মত অভ্যস্ত কান ফিরে পাবেন। প্রতিমা ও সুকুমার যখন এল — তিনি যেন অনেকটা নিজেকে চিনতে পারলেন। প্রতিমা ও সুকুমারের মধ্যে যেন নিজের পুরানো মানুষের হদিশ পেলেন। ওরা যেন তাঁকে বিনয়বাবু অনেকটা ফিরিয়ে দিলেন। ওদের দেখে তিনি যেন আবার পুরানো পরিচিত পৃথিবীকে বেশ ক'দিন পরে ফিরে পেলেন। নিজের অসাড় পায়ে আবার রক্ত-চলাচল শুরু হল।

তবু, তিনি জানেন, পুরানো মানুষকে তিনি ফিরে পেতে চানও নি। কিছুটা ছেলের শবযাত্রার সঙ্গে চলে যাক — এও তিনি চেয়েছিলেন। গোছানো মন ফিরে চেয়েছিলেন — কিন্তু আগের মত গোছানো হোক — এও তিনি চাননি। ছেলের শোকের খেসারত হিসেবে নিজের পুরানো মনের কিছুটা তিনি বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন বই কি। সুকুমার আর প্রতিমার উপস্থিতিতে আশ্বস্ত হয়ে নিজের পুরানো মনকে কিছু কিছু করে ফেরত পেতে লাগলেন — তখন কিন্তু তিনি সবটা প্রসন্ন মনে নিতে পারেন নি। যেন ছেলের স্মৃতির ওপর অবিচার হচ্ছে — যেন পিতৃহৃদয় ছেলেকে, ছেলের জন্যে শোককে ভুলবার জন্যে স্বার্থপরের মত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে — এমন একটা অনুতাপও পুরানো চেহারার সঙ্গে ফেরত আসছিল। নিজের ওপর, একটা গোপন ধিক্কার চোরা কাঁটার মত অহরহ বিঁধত। তবু, তিনি অস্বীকারও করতে পারেন না — ঐ চোরা কাঁটার মত ব্যথাও তাকে এক ধরনের সান্ত্বনা দিত। একটা চোরা কান্নার নিঃশব্দ আর্তনাদ তিনি সবসময়ের সঙ্গী হিসাবে পেতে চান। তিনি যে পুরানো চেহারা চেয়ে — কিছুটা পেয়েও অনুতাপও পেয়েছেন। অনুতাপের মধ্যে তিনি নিজের কর্তব্য দেখতে পেয়েছিলেন — পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পেয়েছিলেন। আবার অনুতাপ যেন বিলাসে দাঁড়াচ্ছে এ কথা স্মরণ করেও নিজেকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, প্রতিমা তাঁর সেবাযত্ন করলে তিনি যেন কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়তেন। যেন যেই মনোযোগ, সেবাযত্ন ছেলের জন্যে

ছিল — তাতে যেন তাঁর অধিকার নেই। ছেলে বেঁচে থাকলে যা প্রতিমার কর্তব্য ছিল — ছেলের মৃত্যুর পরে ঠিক তাই পেয়ে তিনি অপ্রস্তুত হন — কুণ্ঠিত হন। অথচ সেবাযত্নের জন্যে মনও গোপনে আকাঙ্ক্ষা করত না — তা নয়। কেবলই অবুঝের মত মনে হত — তিনি যেন ছেলের অধিকারে হস্তক্ষেপ করছেন। প্রতিমার মনোযোগ তাঁর ওপর রয়েছে — একথা ভাবলেই যেন তিনি এতটুকু হয়ে যেতেন। অনধিকারীর বেদনায় তিনি ভেতরে ভেতরে ভারী ছোট হয়ে যেতেন। কিন্তু তবু, প্রতিমার জন্যে মন অপেক্ষা করত — একটু ঘোমটা টানা মৃদু কণ্ঠস্বরের জন্যে তিনি দিনের ক'টা সময় রীতিমত অপেক্ষাই করতেন। তবু কাছে এলে যেন প্রাণকে — সেই মৃত ছেলেকে — স্পষ্ট করে অনুভব করা যায় — একথা বলে বা ভেবে তখনকার নিজের ভেতবের আড়ষ্টতাকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতেন। প্রতিমা এলে কিন্তু কতক্ষণে প্রতিমা চলে যাবে এই জন্যেই তিনি প্রায় অধীর হয়ে উঠতেন। অপেক্ষাও যেমন করতেন — আবার প্রতিমাকে বিদায় দেবার জন্যে ব্যাকুলও হয়ে উঠতেন। চলে যেতেই স্বস্তি পেতেন—একটু পরেই সেই স্বস্তি একটা শূন্যতা এনে দিত। আজ মনে হয়, কত বৃথা উৎকণ্ঠা, কত অযথা যন্ত্রণায় যে মানুষ জীবনের সবচেয়ে বেশী সময় কাটায়—জীবনের বিরাট বিস্তারের পাশে অধিকাংশ যন্ত্রণাই যেন নিরর্থক মনে হয়। যেন যন্ত্রণার স্বাদে জীবন কাটাবার জন্য যন্ত্রণার নিমন্ত্রণ। নইলে কালে কালে প্রাণও টেকেনি—প্রাণের মৃত্যুকে ঘিরে যত যন্ত্রণা, অস্থিরতা, শূন্যতা, বিষণ্নতা—তাও তো টেকেনি। এক একটা যন্ত্রণার প্রাণশক্তি একদিন না একদিন নিঃশেষ হবেই—একথা যন্ত্রণার মুহূর্তে নিজেকে অন্তর থেকে বোঝানো যায় না—কিন্তু নিঃশেষ সত্যিই হয়। তবে আরেকটা যন্ত্রণা হঠাৎ আরেকদিক থেকে এসে হাজির হয়। জীবন যন্ত্রণা নিয়ে জন্মায়—যন্ত্রণা নিয়ে শেষ হয়। একটা যন্ত্রণা অনেকগুলো যন্ত্রণার জন্ম দেয়—কালে ঐ সকল যন্ত্রণাই একদিন নিঃসন্তান হয়ে বংশহীন হয়—তখন আরেক ধরনের যন্ত্রণা আরো বহু যন্ত্রণার জন্ম দেবার জন্যে এসে যায়। এমনি গোষ্ঠী গোষ্ঠী যন্ত্রণার সমষ্টি কি জীবন! যন্ত্রণায় যে জন্মায়—যন্ত্রণায় সে মরে।

...... মনে হয় কত বেলা যেন হয়েছে। তা নয়, মাত্র ন'টা। এইবার চাকর এসে আরেক কাপ কফি দিয়ে যাবে। কফির তৃষ্ণা থেকেই বুঝতে পারেন ক'টা বাজে। ঘড়ি দেখবার দরকার হয় না। দূরে শর্মিলার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। ওদের তো সবে সকাল। ওদের অভ্যাসগুলো অন্য রকম। সব জিনিসপত্র গোছানোর দিকে কী ঝোঁক—অথচ সময়কে ব্যবহার করতে জানে না। একালের ওরা স্থানের জন্যে ব্যাকুল—সময়ের জন্যে নয়।...এতক্ষণ চিন্তার পর-স্মৃতিচারণার পর যেন মন অনেক উদাস ও নিরাসক্ত হয়েছে—হয়ত, এখন মনে হয়, শর্মিলা জন্মদিনের সংবাদ নিয়ে যখন আসবে—আর একটি যন্ত্রণার কথা বলতে আসবে, যা ক'দিন ধরে বহু যন্ত্রণার জন্ম দেবে—তাকে যেন অনেকটা নিস্পৃহভাবে নিতে পারবে। এখন আর অতো উদ্বেগ বোধ হচ্ছে না। উদ্বেগ কম মনে হতেই তাঁর মনে হল—অযথা একটা সকাল তিনি উৎকণ্ঠায় বাজে

খরচ করে ফেললেন। ভোরের সকাল, পার্কের আড্ডা আর দিনের প্রথম রোদকে তিনি যেন অযথা খরচ করে ফেললেন। উৎকণ্ঠায়, আর প্রায় বৃথা উৎকণ্ঠায় একটা সকাল লোকসান হয়ে গেল। লোকসানের ক্ষোভ ভেতরে দেখা দিতেই তিনি চিন্তাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। অন্তরকে একটু প্রশ্রয় দিলেই—নিজের সম্পর্কে একটু অন্যমনস্ক হলেই—মন যেন ভেতরকার বেদনাগুলোকে তক্ষুনি চেতনায় গছিয়ে দেবে—একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন, অমনি বেদনা দুঃখ উৎকণ্ঠা এসে তাকে ঠকাতে শুরু করবে। এমন করে ঠকে গেলেন নিজের কাছে এত কাল! আর একটা সকালেব লোকসান কি আর এমন ক্ষতি। মন যেন বেদনা, ক্ষোভ আর দুঃখ ছাড়া কিছু জমা করতে চায় না। বেদনার অভিজ্ঞতা হলেই যেন মন তাকে গ্রহণ করবে—নিজের অন্তরে জমা রাখবে—কোল্ডস্টোরেজে তাজা করে রাখবে। দুঃখের ওপর, শোকের ওপর মনের এই পক্ষপাতিত্ব তিনি আজীবন লক্ষ্য করে এলেন।

চাকর এসে কফি দিয়ে গেল। তাঁর মনে হল যেন এতক্ষণ পর একটা জীবন্ত মানুষকে দেখলেন—কবরখানায় বেড়াতে বেড়াতে—হয়ত প্রিয় জনের কবরখানায়—বেড়াতে বেড়াতেই একটা অপরিচিত হলেও জীবন্ত মানুষ দেখতে পেলেন। ইচ্ছে হল, কথা জিজ্ঞেস করেন, তুচ্ছ মামুলি—সুকুমার উঠেছে কিনা—বাজার হয়েছে কিনা—এমনি সাধারণ—এমনি একটা কিছু। একটা মানুষের কণ্ঠস্বব খুব কাছাকাছি থেকে। আব নিজের কণ্ঠস্বর। তিনি যে বেঁচে আছেন—নিজের কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে যেন তিনি তা শুনতে পান—নিজের কণ্ঠস্বর শুনে বেঁচে যে আছেন তাতে আশ্বস্ত হতে চান। কবরখানার বাইরের জগতও আছে তাও যেন অনুভব করতে ইচ্ছে হয়। নিজের কানে যেন শুনতে চান—তিনি এখনও বেঁচে। আর চাকরের সঙ্গে কথা বলা শর্মিলার চেয়ে নিরাপদ। শর্মিলার নানা কুকুর-কৌতূহল, শর্মিলা এলে যেন ঘর দুয়ার আসবাব পত্রগুলোও ওর দখলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—নিজেকে কেমন হঠাৎ অবাঞ্ছিত মনে হয়। ঘর-দোর ও ফার্নিচার সব যেন কেমন পর হয়ে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু চাকরের বেলায় তা হয় না। ও যেন কর্তব্য পালন করতে আসে—ওর কোন দাবী নেই। ওর চোখে জবর দখলের কোন জ্বলজ্বলে ইচ্ছে নেই। তবু, তিনি জানেন, ওর সঙ্গে কথা বলা চলবেনা কোনোদিন কিছু বলেন না। শুধু আত্মমর্যাদার প্রশ্নই নয়— চাকরদের সঙ্গে কথা বলা ইদানীং ওর স্বভাবে নেই তা ঠিকই—হয়ত কথা বললে শর্মিলার আধিপত্য অধিকারে হাত দেওয়া হবে তাও ঠিক। তবু বলবেন না—কারণ, চাকর ভারী আশ্চর্য হবে—হয়ত বুড়োবাবু ওর সঙ্গে কথা বলেছেন এই আনন্দে বা কৌতূহলে এক্ষুনি তা বাড়িতে রটে যাবে। হয়ত শর্মিলা ভাববে বাজারে ত্রুটি হচ্ছে কিনা—ওদের কখন দেরীতে ঘুম ভাঙ্গা নিয়ে তিনি গোপনে সংবাদ নিচ্ছেন। না, নিজের কণ্ঠস্বর শোনা হবে না। গোরস্থানে কোন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলা ওর কপালে নেই। জীবন্ত মানুষ কাছে এলেও, তাঁর ইচ্ছে থাকলেও—পাশ কাটিযেই যেতে হবে। ঐ মৃত মূর্তিগুলো ক্ষুণ্ণ হয়ত হত না—এখানে জীবনের কোন লক্ষ্মণ দেখলে। ওরাও হয়ত জীবন্ত কণ্ঠস্বর

শুনলে খুশীই হোত। তাই তাঁর মনে হয়—হয়ত ঐ মৃত তরুণ-তরুণীগুলোও তাঁর মত মৌন বৃদ্ধের চেয়ে শর্মিলাকেই বেশী পছন্দ করে—ওদের জীবনের ওপরে লোভ শর্মিলাকে, সুকুমারকে দেখলে অনেক বেশী তৃপ্ত হয়। হয়ত, ঘর-দোর ফার্নিচারটার মত ওরাও—শর্মিলা এলে—শর্মিলার দলে গোপনে চলে যায়। ওরাও জীবনের আস্বাদের জন্যে ভেতরে ভেতরে তাঁকে দেখে ক্লান্ত। জীবনের কাছে আজ প্রায় তিনি অপাঙ্‌ক্তেয়—মৃত্যুর কাছে অস্পৃশ্য। জীবনের পক্ষে অনাবশ্যক—মৃত্যুর কাছে অপ্রয়োজনীয়। তাঁর কাছ থেকে জীবন কিছু পাবে না—মৃত্যুর তিনি গলগ্রহ। জীবনে তিনি অরক্ষনীয়, মৃত্যুতে তিনি বিধবা। জীবনে কিছু পাবার নেই—মৃত্যু তাকে ত্যাগ করে গেছে।.... চাকর আবার এসে কাপ-প্লেট নিয়ে গেল। তিনি চাকরের দিকে ফিরেও তাকালেন না। গোরস্থানে তিনিও জীবন্ত মানুষকে গ্রাহ্য করবেন না। ছবিগুলোর দিকেও আর তাকালেন না—মনে বেদনা এলে যা সচরাচর করে থাকেন। যাক্, গোরস্থানে মৃত ও জীবন্ত কাউকে তিনি দেখতে চান না। দু'নৌকোয পা দিয়ে আছেন বহুকাল—কিন্তু কোনো নৌকোর লোকই তা পছন্দ করছে না—কোনো নৌকোয় তাঁর কোন অধিকার নেই। বুক চিরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হল। একটা তৃপ্তিও পেলেন। সেই তৃপ্তিতে যেন একটা ক্ষীণ বিলাসের মত হিসেব করলেন—যত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর অন্তর থেকে বের হয়েছে—দীর্ঘনিঃশ্বাস বোধ হয় তাঁর চেয়ে কম হবে না। তাঁর ফুসফুস যেন দীর্ঘনিঃশ্বাসেই সহজ হয, স্বাভাবিক হয।

না, বেলা বেশি হয়নি—মাত্র ন'টা। আটাত্তর বছর যে জীবন লাগল কাটতে—সেই জীবনের কথা ভাবতে ঘণ্টা তিনেকও লাগে না। অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা—তার প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণ করতে কতটুকুই বা সময় লাগে। অথচ জীবনের অধিকাংশ সময়—যা নিঃশব্দে, অগোচরে, বিনা নাটকে, তাকে বাঁচিয়ে রেখে এসেছে—সেই অধিকাংশ জীবনটাই তো তিনি ভুলে গেছেন। ঘটনার কড়া রঙে যে মুহূর্তগুলো তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে—তা মনে করতে তিনঘণ্টাও লাগল না। আর বাকি জীবনটা... যা ব্যথা না দিয়ে, বেদনা না দিয়ে তাকে সেবা করেছে এসেছে—সেই পুরানো চাকরের মত তাকে তিনি মনে রাখেন নি। সুখের স্মৃতি বড় তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়—নতুন সুখের সম্ভাবনা না থাকলে অকৃতজ্ঞ মানুষ পেছনের সুখকে মনে রাখতে চায় না। দুঃখের ঘা শুকিয়ে গেলেও তার দাগ মিলিয়ে যায়না। এক একটা যন্ত্রণা এক একটা পরিবার সৃষ্টি করে একদিন সবংশে নির্বংশ হয়—কিন্তু এদের ফসিল থাকে, স্মৃতিস্তম্ভ থাকে, পিরামিড থাকে। যে পিরামিড তৈরী হতে বহুকাল লেগেছিল—তা দেখতে কতক্ষণ সময় লাগে? এমনকি নিজের জন্যে পিরামিড তৈরী করতে ফারাওরা যত সময়, শ্রম, অর্থ, ব্যয় করেছিলেন—শেষ হবার পর তা চূড়ান্ত ভাবে দেখতে সেই ফারাওদের কতক্ষণ লেগেছিল—নিশ্চয়ই তিনঘণ্টার কম।

অথচ এই ফসিল, পিরামিড না হলেও চলত—তাঁর জীবনে এদের কোন আবশ্যাকতা ছিল না—প্রয়োজনও কি ছিল? তাঁর শোকের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের কোন বিশেষ

পরিকল্পনা রূপ পায়নি—কোন বার্তা তাঁর জীবনে নেই। তিনি গোপনে আছেন—জন্মদিনে ধরা পড়বেন—আবার আত্মগোপন করবেন এই ঘরে। একদিন যখন তিনি মরবেন—তখন মৃত্যুর এত কাছাকাছি থাকবার জন্যে কেউ শোক করবে না—শান্তভাবে নেবে। তারপর জন্মদিন যখন আর হবে না—তখন জন্মদিন যে হল না—নেমতন্ন যে এল না—তাও লোকের মনে পড়বে না......।

আটাত্তর বছরে মাত্র তিন ঘন্টার জীবন তাঁর ...... বাকীটা লুপ্ত.... আর এই তিনঘন্টার ঘটনা তাঁর জীবনে না ঘটলেই তিনি সুখী হতেন—হয়ত সমস্ত জীবনটাই উল্লেখযোগ্য ঘটনার কড়া রঙ থেকে বেঁচে সহজ হত, স্বাভাবিক হত, হযত সুন্দরও হত। জীবনে খ্যাতি অখ্যাতি যেমন নেই, সহজ স্বাভাবিকতাও তেমনি নেই। অপ্রকৃতিস্থ হননি—অথচ একটা অস্বাভাবিকতার ঝড়ের মধ্যে জীবন কাটালেন। অথচ এই জীবনের এই দুর্ঘটনার—মাত্র তিন ঘন্টার স্মৃতিচিত্রেই যা নিঃশেষিত—কোন প্রয়োজন ছিল না! না ঘটলেও তো ঘটতে পারত। ঘটবার মধ্যে কোনো অনিবার্যতা নেই— সঙ্গত কারণ নেই, উদ্দেশ্য নেই। এই কারণগুলো না এলেও তো পারত। সাবাজীবন কতগুলো উগ্র কারণ—অসহিষ্ণু কার্য তাকে পীড়া দিয়ে গেছে—অথচ তিনি শান্ত, নম্র, বিনযী থেকেছেন। তাঁর শান্ত, নম্রতাকে জীবন কোন মূল্য দেয়নি। না দিক—জীবনের আচবণ ভদ্র হয়নি—তিনিও জীবনকে আপন করে নেননি—আপন হযও নি।....

নিজের ঘরের জীবনের মনে রাখবার মত ঘটনাগুলো সবই শোকেব, দুঃখেব, বেদনার। যত তিনি ঘরের জীবনকে এড়াতে চেয়েছেন, পাশ কাটাতে চেযেছেন, ঘর সম্পর্কে অন্যমনস্ক ও উদাসীন থাকতে চেয়েছেন—ততই হঠাৎ হঠাৎ তা উৎকট হযে সব ছাপিযে উঠেছে। ঘবের জীবন যেন বাড়ির মধ্যে গোপনীয়তাকে অস্বীকার করে সকলেব চোখে পড়বার জন্যে ব্যাকুল হযেছে বার বার। এক একটা ঘটনা যেন চিৎকার কবে উঠেছে—সেই পুরবালার মৃত্যুর সেই পোস্টকার্ডখানা—দু'পয়সা না এক পয়সার পোস্টকার্ডখানা থেকে শুরু। পরে, প্রাণের মৃত্যুর সময় কত ভূমিকা—কি ব্যাপক উপসংহার। অবশ্য পুরবালার মৃত্যুর মতই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ঘটনাও ঘটেছে। প্রতিমার মৃত্যু-সংবাদ। তখন সুকুমাব কলেজে পড়ে। ভাইযের ছেলের অন্নপ্রাশনে প্রতিমা গেছে—পরীক্ষা সমানে তাই সুকুমার যায়নি। সেই অন্নপ্রাশনের দিনেই—বিনাভূমিকায় হঠাৎ হার্টফেল। কি-ইবা বয়েস হযেছিল। ছেলে মানুষই বলতে গেলে। সব যখন শান্ত হয়ে এসেছিল—তখনই...। সংবাদ পেয়ে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সুকুমারকে পাঠিযে দেওয়া হল। তিনি যাননি।.... না, প্রতিমার কোনো ফটো এ ঘরে নেই। সুকুমারের ঘরে আছে। এখনও স্পষ্ট চোখের সামনে যেন প্রতিমাকে দেখতে পান— পুরবালার মত ফটো দেখে মনে করতে হয না—প্রতিমার ফটো এ ঘরে না থাকলেও চলে। বেশ মোটা হয়ে যাচ্ছিল—ভারী হয়ে আসছিল শেষের দিকে।..... তিনি যেন অনেকটা তন্ময হয়ে প্রতিমাকে ভাবেন—মাথায় ঘোমটা, সিঁথি শূন্য, সেই সাদা শাড়ী.... না, প্রতিমার সধবা চেহারা মনে আসে না—ওর বিধবার চেহারাই যেন স্থায়ী। বিনয়বাবু কিছুক্ষণ যেন মনের মধ্যে

প্রতিমাকে অবাধে চলাফেরা করতে দেন—কোন বাধা দেন না। কোনো আপত্তি করেন না—নিষ্ক্রিয় হয়ে বিধবা পুত্রবধূর চলাফেরা লক্ষ্য করে যান—নিজের আড়ষ্টতাকেও যেন নিস্পৃহভাবে, নিরাসক্তভাবে দেখে যান—মনে কোন ঢেউ ওঠে না— বরং এই নিস্তরঙ্গ নিরুদ্বিগ্ন মনোযোগটি তাঁর ভালই লাগে।

সবচেয়ে আশ্চর্য, প্রতিমার মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত এলেও সেই বজ্র যেন তাঁকে স্পর্শ করতে পারল না। সংবাদটি শুনে যত মুষড়ে যাবেন ভেবেছিলেন, ততটা মুষড়ে যাওয়া দূরে থাক—হঠাৎ বাজ পড়বার মতই একটু চমকে উঠেছিলেন মাত্র। এই মুষড়ে না পড়বার জন্যেই তিনি নিজেকে একটা প্রবাদ-বাক্যে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন: অল্পশোকে কাতর, বেশি শোকে পাথর। অন্তরে শোক অনুভব না করবার নৈতিক অস্বস্তিতে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন, পুত্রশোকের তীব্রদাহে যে অন্তর শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে—সেখানে একপশলা বৃষ্টির কোন প্রভাব কিভাবে আশা করা যায়? কিন্তু মৃত্যুর দু'তিন দিনের মধ্যেই যেন ভেতরে ভেতরে কেমন একটা নিষ্কৃতির প্রচ্ছন্ন শান্তি ও পবিত্রাণের সূক্ষ্মস্বস্তি লক্ষ্য করতে থাকেন। চির-গম্ভীর চেহারায় এমনিতেই কোন ভাবাবেগ নেই—এবার যেন সেই গাম্ভীর্য ও ভাবলেশহীন চেহারার সুযোগে তিনি না নিয়ে পারলেন না। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটা বন্ধনের গুরুভার থেকে যেন তিনি যথেষ্ট হাল্কা বোধ করতে থাকেন। মৃত্যুর বেদনা তাকে স্পর্শ করল না—এতেই কৃতজ্ঞ হয়ে তিনি যেন আর নিজেকে বিচার করতে চাইলেন না। যত বেশি আত্মবিচার তত দুঃখ। তবু, এই কথাটিও তিনি অতি হাল্কা ভাবে চেতনার ওপর দিয়ে ভেসে যেতে দিলেন। মেঘকে কোন আহ্বান জানালেন না। কোন কাল বৈশাখীর ওপর কোন মোহ নেই। বর্ষণের জন্যে মামুলি ক্ষিদে তাকে কোন ভাবে ঘিরে ধরল না। প্রতিমাকে আর দেখতে হবে না—এতে স্বস্তি কেন? কেন জোর করে মৃত্যু এসে পুত্রবধূকে সরিয়ে নিয়ে বিনয়বাবুর অন্তর থেকে একটা আকার-প্রকার হীন অপরাধবোধের বোঝাকে তুলে নিয়ে গেছে, কেন পুত্রবধূকে দেখবার ও সেবাযত্ন পাবার আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে একটা গোপন তৃপ্তি লাভ করেছেন—এ সব নিয়ে আত্মসমালোচনা করতে সাহস পান নি। নিজেকে তিনি এবার এড়িয়ে গেলেন। বরং সুকুমারকে দিয়ে সাড়ম্বরে শ্রাদ্ধ করাবার কাজে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। তবু দু'একবার এরই মধ্যে নিজেকে বুঝিয়েছিলেন—পুত্রবধূর শূন্যসিঁথি দেখতে হবে না, এর জন্যেই কি বেদনার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। তবু, মন এতে সায় দেয়নি। তিনিও অন্তরের আত্মবিশ্লেষণের চাহিদাকে এবার আর গ্রাহ্য করলেন না। যে অন্তর বেদনা দিতেই অভ্যস্ত-বিশ্লেষণের শেষে ঐ এক গ্লানি বা বেদনাকেই হাজির করবে। নিজের মন যুগিয়ে সব সময় চলা যায় না।

আস্তে আস্তে যতই দিন যেতে থাকে, প্রতিমার অভাবে কেমন একটা বিস্বাদ ও আকর্ষণহীন হয়ে ওঠে দিনগুলো। প্রতিমার অভাবে দিনগুলো যেন কেমন নিষ্প্রাণ, নিস্তেজ ও জড় হয়ে যেতে থাকে। সংসারের যে এতদিন শ্রী ছিল, সৌন্দর্য ছিল,

আকর্ষণ ছিল—আজ সেই সব চলে গেলে তিনি টের পেলেন এতদিন সংসারের শ্রী, সৌন্দর্য ও আকর্ষণ ছিল। তা সোচ্চারভাবে ছিল না—নীরবে, গোপনে, তাঁর সেবাযত্নের মত প্রচ্ছন্ন ছিল।

দিনের পর দিন কেমন একটা শূন্যতা, বিস্বাদ ও আকর্ষণহীনতা তাকে নীরস করে ফেলছিল। সেই সংগে একটা পরিচয়হীন অপরাধবোধ। এই নাম ঠিকানাহীন অপরাধবোবাধ কাঁটার মত এক এক সময় এমন বিঁধতে থাকত—নিজের কাছেই নিজে সংকোচে, লজ্জায়, কাঁচুমাচু হয়ে যেতেন। তবু ভরসা করে সেই অপরাধবোধের পরিচয় জিজ্ঞেস করতে পারতেন না। আর আগের মত জোরও যেন নিজের ওপর করতে পারেন না। তাঁর কঠোর হবার শক্তি-এত কমে গেছে—ভাবতে ভারী খারাপ লাগত।

নিজেকে কত বুঝিয়েছেন, বেদনা অনুভব করবার লোভে শোকপাবার লালসায় তিনি এই শূন্যতাকে, বিষণ্নতাকে, অপরাধবোধকে বার বার ডেকে আনছেন—মুখোমুখী হচ্ছেন—কখনও কখনও ভাবতেন সারাক্ষণ মনের পাশাপাশি বসে—মনকে নিয়ে এত ঘর করে—মনের স্ত্রৈণতার জন্যেই তাঁর এই পরিণতি। মনকে তিনি নিজের ঘাড়ে চড়াতে দিয়েছেন—মন সেই থেকে চাবকে তাকে অস্থির করে তুলেছে। অপরাধবোধ এলেই তিনি বিরক্ত ও বিষন্ন হয়ে উঠতেন। নিজের পরিচয় জানতে আব তাঁর ইচ্ছে নেই। নিজেকে জানায শান্তি নেই, স্বস্তি নেই—এমন কিছু লাভও নেই। আত্মজ্ঞানে আত্মগ্লানি। বাইরের জীবনে পাবার কিছু নেই। সেখানে শূন্যতা—অসীম শূন্যতা—নক্ষত্রহীন অসীম অন্ধকার—আর অন্তরে দিনের তপ্ত মরুভূমি—বালির ঝড়। অন্তরকে তিনি প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে বড় বেশি মাথায তুলে দিযেছেন। এখন আর বাগ মানতে চায় না।

বিনয়বাবু অন্যমনস্ক হয়ে যান। সেই প্রতিমা—সেই অপরাধবোধ, সেই নিরস শূন্যতা—আজ কিছুই নেই। আত্মগ্লানি, অপরাধবোধ, শূন্যতার শুষ্কতা—এ সবের মধ্যেও কেমন যেন জীবনকে উপলব্ধি করা যায়। এই অনুভূতিগুলোর মধ্যেও বেঁচে থাকার উষ্ণতা থাকে। শুধু স্মৃতির নিরাসক্ত দর্শকের মধ্যে জীবনের কোনো স্পন্দন নেই। চলন্ত ট্রেনের দু'পাশে পালিয়ে যাওয়া শহর গ্রামের দিকে উদাসীন ভাবে তাকিয়ে থাকলেও—সেই শহর গ্রাম পরিচিত হলেও তাতে আর স্পর্শের উত্তাপ থাকে কই? চেতনায় স্মৃতির পর স্মৃতির আসা যাওয়া যেন একটা যান্ত্রিক ব্যাপার, দেহ যন্ত্রের জৈবিক ক্রিয়া মাত্র। চেতনা যেন এখন আর জীবনের রসে পুষ্ট নয়—চেতনা যেন যন্ত্র—কেবল স্মৃতি উৎপাদন করে চলেছে। যন্ত্রের উপলব্ধি থাকে না—অনেক বেশি উৎপাদনেও যেমন উৎফুল্ল হয় না—একটু মাত্র উৎপাদনেও হীনতাবোধ নেই—যন্ত্র যেন চলে চলে পুরানো হয়—কিন্তু ক্লান্ত হয় না—তিনিও স্মৃতির চর্চায় ক্লান্ত নন—কিন্তু প্রাচীন। যন্ত্রও নিরাসক্ত, তিনিও। যন্ত্র নিষ্কাম, তিনিও। যন্ত্রও একদিন বিকল হবে—তিনি কবে বিকল হবেন? চিরকালের মত? কবে? জীবনের নিরাসক্ত দর্শকের ভূমিকায় কিছু উপলব্ধি করতে না পারার গ্লানিও যেন তাঁর নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে ও বাইরের

জগতের বাতাসকে একটু বেশি করে বুক ভরে টেনে নেবার যে চেষ্টা আছে—সেই অন্তরঙ্গ দীর্ঘনিঃশ্বাসও আজ তাঁর বড় পড়ে না।

এখন—এই মুহূর্তে মনে হয়, জন্মদিনও তিনি সহ্য করতে পারবেন। জন্মদিন যেন আর তাঁকে ভয় দেখাতে পারবে না। চোখবুঁজে জন্মদিনের ছবিগুলো স্মরণ করলেন। না, কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না দেখে আনন্দও অনুভব করলেন না, আশাভঙ্গও না। না, তিনি পারবেন। উপলব্ধির ক্ষমতা চলে যাবার এই হচ্ছে নীট লাভ। মনে মনে ভাবলেন, আসলে বছরে একবার বিচলিত হওয়া তার একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। জন্মদিন এলেই বিচলিত হবার জন্যে যেন ব্যগ্র হয়ে থাকেন। হয়ত এই বিচলিত হবার মধ্য দিয়ে তিনি একটা অনুভবের জন্যে লালায়িত হন—একটা কিছু উপলব্ধি করবার জন্যে তাঁর ইচ্ছে হয। হয়ত যতটা বিচলিত তিনি হন বলে মনে করেন—ততটা হন না। হন যে না—এই মুহূর্তে যেন বেশী করে বোঝেন। বিচলিত হবার অনুভূতিকে যতটা আপন ভাবেন—হয়ত ততটা আপন ঐ অনুভূতিটি, উপলব্ধিটি নয়। হয়ত অনুভূতি পুরানো অনুভূতির নকল। হযত উপলব্ধিটি ছদ্ম-উপলব্ধি। নিতান্ত অভ্যস্ত বলেই এতকাল তিনি টের পান নি। এখন, এই মুহূর্তে, জন্মদিনগুলোকে নদীর অপব পাড়ে পরিচিত গ্রামের মত সুদূর মনে হয। যে গ্রামে আপনজন কেউ নেই—কেবল চেনাজানা আছে—তাও যেন অনেকদিনের। বিনয়বাবু সিদ্ধান্ত করেন—জন্মদিন এখন আর বীভৎস নয়। সহ্য করা যাবে। যদি অসহ্য হয়ও—সেই অসহ্য হওয়াও একটা অভ্যাস-নিছক অভ্যাস—যার তলায় মাটি নেই—শক্ত ভূমি নেই।

আরও একটা কথা মনে হয়—আগে আগে মনে হলে কেমন বিশ্রী লাগত—ভাবতে না চাইলেও না ভেবে পারতেন না—-এখন আর সেই পুরানো কষ্ট, সেই পীড়িত বিবেক—তাকে লাঞ্ছনা দেয় না। প্রতিমার জন্যেই সুকুমারের আকর্ষণ। প্রতিমা'র মৃত্যুর পর সুকুমার সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন উদাসীন হযে পড়ছিলেন। যদিও সহানুভূতি বেড়ে যাবারই কথা। তবু সহানুভূতিকে কষ্ট করে ডেকে আনতে হত—ডেকে আনা কর্তব্য মনে করতেন। অল্প বয়েসে পিতার স্নেহ বঞ্চিত, এখন মা-ও নেই—ওর ঠিক আপন বলতে কে আছে—অথচ কাঁচা বয়েস। এসব চিন্তা করে করে সহানুভূতিকে জাগাতে হত। কিন্তু বাইরে সুকুমারের ওপর—ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে—নজর রাখলেও—ভেতরে ভেতরে প্রতিমার মৃত্যুর পর সুকুমার কেমন যেন কিছুকালের জন্য গৌণ হয়ে গেল। তখন নিজেকে বুঝিয়েছেন—পুরবালার মৃত্যুর পরেও তো প্রাণ এমনি কিছুকালের জন্যে ঝাপসা হয়ে অস্পষ্ট হয়ে দেশের বাড়িতে ছিল। তখন, কখনও কখনও এও মনে হত, বেশি আত্মীয়স্বজন থাকলে—ছেলেমেয়েরা পিতামাতার মৃত্যু ঘটলে এত বেশী আদরযত্ন পায়—শাসন পায় না—ফলে একদিকে যেমন বাবা-মা'র অভাব ঠিকমত বুঝতে পারে না—অভিভস্ত ঠাকুর্দা ঠাকুরমা, পিসি মাসি মা-বাবার অভাবকে আড়াল করে দেয়। ওর পাওনা অভাববোধ ও স্নেহের বঞ্চনাবোধ থেকে ওকে বঞ্চিত করে রাখা হয়। অন্যদিকে বাবা-মা'র অভাবে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাব স্বাভাবিক

ভাবে বেড়ে ওঠে না। বিগড়ে যায়, প্রশ্রয় পাওয়া ছেলে হয়ে ওঠে। প্রাণ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। বাবা-মা'র অভাবে স্নেহ ও শাসন থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রশ্রয় আর আদর পেয়ে ছেলের মানসিক গঠনে স্নেহ ভালবাসা স্বাভাবিকভাবে বাসা বাঁধতে পারে না—অন্যদিকে শাসন না পেয়ে স্বভাবকে সংযত করতে শেখে না। ফলে ছেলে বড় বেশী আত্মকেন্দ্রিক—স্বার্থপর হয়। আর আত্মীয় স্বজন না থাকলে বা আদর বা প্রশ্রয় না দিলে ছেলে পৃথিবীকে পর ভাবতে শুরু করে—সংগ্রাম ছাড়া কিছু বোঝে না—বড্ড বিষয়ী হয়—টাকা পয়সাই একমাত্র পরমার্থ-ধ্যানজ্ঞান জপ হয়ে দাঁড়ায়। এরা জীবনে ভালো কাজ পেলে আত্মম্ভরী হয়। সুকুমারের ওপর অযাচিত সহানুভূতির অভাবকে নিজের ভেতরে লক্ষ্য করে—নিজেকে এই ভাবে সান্ত্বনা দিতেন। সুকুমার সম্পর্কে অনুভূতির একটা প্রোগ্রামও তৈরী করতেন। স্নেহ থাকবে, প্রশ্রয় থাকবে না। স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়ই দেবেন—দরকার পড়লে শাসনও করবেন। তার সহানুভূতি মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশ করে—ওর মাকে আড়াল করে দেবেন না।

আবার প্রতিমার ছবি ভেসে ওঠে। প্রতিমার সেবাযত্ন। প্রাণের মৃত্যুর পরে প্রতিমার সেবাযত্নের ছবি মনে আসে। প্রতিমার সেবাযত্নে তিনি শুধু কুণ্ঠিত হতেন না—সেই অপরাধবোধের একটা জবাবও যেন তিনি পেতেন। জবাবটি আত্মগ্লানিকে উস্কে দিত। নিজের মৃত ছেলের কাছে অপরাধী মনে করতেন। অনেকক্ষণ ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে—তিনি যে অপরাধী নন, একথা মৃত প্রাণের ছবির কাছে প্রমাণ করতে চাইতেন। প্রতিমার সেবাযত্ন মনোযোগে যে প্রাণের পাওনা ছিল—তা যখন তাঁর কাছে এসে পড়ত—তখন কুণ্ঠায়, সংকোচে ভেতরে ভেতরে ভারী ছোট হয়ে যেতেন। যেন ছেলের অধিকারে, ছেলের দাবীতে তিনি ভাগ বসাচ্ছেন—অংশ নিচ্ছেন। মনে হত, স্বামীর স্মৃতির তর্পণে প্রতিমার যে মনোযোগ নিঃশেষিত হওয়া উচিত—তা যেন তাঁর সেবাযত্নের মধ্যে শেষ হচ্ছে, তিনি যেন প্রতিমাকে সেবাযত্ন করতে নিষেধ না করে—ছেলের স্মৃতিকে অবহেলা করছেন। তাই বাইরে অটল অচল ও নিস্পৃহ অথচ ভেতরে ভেতরে একটা মিশ্র অপ্রসন্নতাকে তিনি কিছুতেই এড়াতে পারতেন না। তাই প্রতিমার মৃত্যুর পরে—আর সেবাযত্ন না পাওয়াতে তিনি কেমন স্বস্তি ও নিস্কৃতি পেয়েছিলেন। যদিও কিছুকাল সবই বিস্বাদ, আকর্ষণহীন ও শূন্য মনে হত—তবুও তিনি যে একটা বড় রকমের নিষ্কৃতির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিলেন—বুকের অপরাধের বোঝা কেমন খালি হয়ে গিয়েছিল—শূন্য হয়ে গিয়েছিল—একথা আজও মনে আছে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন। বেলা হয়েছে—স্নানের সময় হল। ঘড়ির দিকে না তাকিয়ে রোদের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারেন ক'টা বাজে। কোন ঋতুতে বারান্দায় ছাদে, ছাদের কার্ণিসে কখন রোদ কতটা থাকে—মুখস্ত তাঁর। তবু, ঘড়ি দেখলেন। স্নানে যাবার তাড়া দুইগুণ অনুভব করবার জন্যেই এই ঘড়ি দেখা। অফিসেও তিনি বুঝতে পারতেন—ঘড়ি না দেখেই—কখন ছুটির সময় হল। নিজের ক্লান্তির দিকে নজর পড়তেই

তিনি বুঝতেন—এখন সাড়ে পাঁচটা। কোন কালেও অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে কোন আকর্ষণ বোধ করতেন না। তবু ফিরতে হত—রোজই। রোজ রোজ সাড়ে পাঁচটায় একটা অনিচ্ছাকে তিনি সহ্য করে এসেছেন। রোজ সাড়ে পাঁচটায় একটা সহ্য শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সারাদিনের কাজের শেষে ক্লান্তির চেয়েও বাড়ি ফেরবার চিন্তায় যে অবসন্নতা—তাই ছিল বেশী কষ্টকর।..... যেদিন তিনি অবসর নিলেন—সেদিন কান্নায় তাঁর কণ্ঠ বুজে আসছিল বার বার। কেবল মনে হচ্ছিল—এবার যেন জীবন শেষ হয়ে গেল। এতখানি শূন্যতা—এতবড় মরুভূমি—এতবড় অবলম্বন খসে যাওয়া—ধরতে গেলে সমস্ত আশা শেষ হয়ে যাওয়া—জীবনে আর কোনদিন আসেনি। পুরবালার মৃত্যুতে যেই কর্মজীবনে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন—প্রাণের মৃত্যুতে যে ছিল সান্ত্বনা—প্রতিমার মৃত্যুতে যেই অফিস ছিল নিজেকে ভুলবার জায়গা—সেই অবলম্বন যখন চলে গেল—সেদিন তিনি যেন চোখের সামনে নিজের মৃতদেহ সৎকার করবার বেদনা ও অসহায়তা নিয়ে বাসায় এলেন। যদিও বাইরে অটল, অচল ছিলেন। বিদায়ী উৎসবেও সংক্ষেপে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু বুঝলেন—এ অবসর মৃত্যুর চেয়ে ভয়ংকর---একটা অনাবশ্যক জীবন তিনি যাপন করতে যাচ্ছেন—যার কোন মূল্য নেই। এমন অবলম্বনহীন জীবন—এর চেয়ে বড় শোক আর কি হতে পারে? সেই ঘর.... মৃতলোকের ফ্রেমে-আটা কবরে যেন তিনি জ্যান্ত প্রবেশ করছেন—পৃথিবীর লোক আর তাকে বের হতে দেবেনা সেই কবরখানা থেকে—আর তাকে চায় না। সেদিন ফিরে লাইট না জ্বেলে কতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। বুঝলেন, এবার জীবন শেষ হল—এবার কবে মৃত্যু আসবে, বসে বসে সেই দিন গোণা।

অবসর জীবনকে তিনি নিঃস্ব জীবন বলেই ভেবে এসেছিলেন। তবু, এই নিঃস্বতাকে যতটা দরিদ্র ভেবেছিলেন — এই কর্মহীন অবকাশকে যত শূন্যতা ভেবেছিলেন — এই অবলম্বনহীনতাকে যতটা শ্মশানের চিতা নিভে যাবার পরের মুহূর্তের রিক্ততার হাহাকার ভেবেছিলেন, দিনরাত্রি দুঃসহ একলা হবার মধ্যে জীবনের চূড়ান্ত উপসংহার যে নির্বাসন — এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন — আসলে কিন্তু অবকাশ নির্বাসন হল না — নিজের ঘরকে যতটা কারাকক্ষ ভেবেছিলেন ঠিক গৃহ অতটা বন্দীদশা হল না। কারাগৃহ না হয়ে তিনি গৃহে অন্তরীণ হলেন। আস্তে আস্তে বাইরের কর্মকাণ্ড থেকে যখন তাঁর বিদায় ঘটল — তিনিও যেন সেই কর্মপ্রবাহের ওপর আকর্ষণ হারিয়ে ফেললেন। দুপুর বেলা খাবার সময় লাঞ্চের কথা মনে পড়বে, পাঁচটার সময় পুরানো ক্লান্তির কথা মনে করবেন ভেবেছিলেন — ঠিক তেমনভাবে অফিস আর আমন্ত্রণ জানাল না। তাঁর অফিস ঘরে অন্য লোক — নিচুওয়ালা ও উপরওয়ালাদের কাছে সেই মানুষ আজ আপনজন। এসব কথা কেমন করে যেন অফিস সম্বন্ধে তাকে নিরস করে তুলল। তবু, অবসর নেবার লজ্জায় তিনি বেশ কিছুদিন বের হননি। বাইরে --- পশ্চিমে বেড়াতে বের হলেন। অবসর পাওয়া মানুষদের কাছে তাজা অবসর পাওয়া মানুষ হিসেবে সকালে হাজিরা দিতে এই মুহূর্তে রাজি ছিলেন না। যেন অবকাশকে কিছুটা সয়ে নিয়ে — একটু

পুরানো রিটায়ার্ড হিসেবেই তাঁদের কাছে যাবার জন্যেই এই পশ্চিমে বেড়ানো। শুধু কি তাই, কিছুদিন বাইরে বের হয়ে অফিসকে যতটা দূরে রাখা যায় — অফিস থেকে যত দূরে থাকা যায়। নিজেকে বোঝালেন — এবার অভ্যাসগুলো বদলাবার জন্যেই একটু বে-টাইম জীবন যাপন দরকার। আস্তে আস্তে ঘর তাঁর খারাপ লাগেনি — স্মৃতির যে জগত অফিসের দরজায় প্রবেশ পায়নি — এবার সেই পুরানো জীবন-পুরানো ছবি-পুরবালা, প্রাণ, প্রতিমা — ঘোরা ফেরা শুরু করল। অফিস পর হল। ঘর আপন না হলেও অপরিচিত হল না। বই অবকাশকে নির্বাসন হতে দিল না। নতুন জীবন, নতুন অভ্যাস একরকম গা সওয়া হয়ে এল। পরে — অনেক পরেও অফিসের রাস্তায় তিনি যেতে পারতেন না। তবু, পড়ন্ত বিকেলে মনে হত — সবচেয়ে আগে ছেড়েছে পুরবালা — সবচেয়ে শেষে তাকে বিদায় দিল অফিস। পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে মাউন্ট আবুতে এক সাধকের সঙ্গে দেখা হল। শান্ত, সৌম্য, প্রসন্ন, নিরুদ্বিগ্ন। মনে মনে ভাবলেন, এতো বাইরের চেহারা — তাঁর চেহারায় শান্ত, সৌম্যভাব — অন্ততঃ জনমত ও আয়না তাই বলে। বাইরের চেহারায় অন্তর কতটুকু ধরা পড়ে। অন্তরের ঝড় দেহের প্রাচীরে সব সময় কি চিহ্ন রেখে যায়। মনের চেহারা দেহের চেহারা এক নয়। দেহের চেহারায় মনকে আবিষ্কার সবসময় ঠিক নয়। চিন্তা-অনুভূতি ইচ্ছার তরঙ্গ কি রক্ত-মাংস মজ্জার মধ্যে সব সময় প্রকাশ পায়। দুটোর প্রকৃতি তো এক নয় — একটি মানসিক অপরটি জৈবিক। যাই হোক, তিনি দীক্ষার কথাও ভাবলেন। সাধককে জানালেন — আপনজন আমাকে ছেড়ে চলে যায়। মরে যায়। ভগবানকে আপন ভাবলে তিনিও ছেড়ে যাবেন না তো? মরে যাবেন না তো? ঈশ্বব যদি আমার ভাগ্যে মরে যান।

সাধক প্রসন্ন হাসিতে চোখ বুজে রইলেন। তারপর বললেন — তুমি দুশ্চিন্তার ভালবাসায় বড্ড মগ্ন।

বিনয়বাবু জবাব দিলেন — আমার তো উল্টোটাই মনে হয় — দুর্ভাগ্য আর দুশ্চিন্তা — ওরাই আমাকে বড্ড ভালবাসে। কিছুতেই ছাড়তে চায় না। আমি ওদের চাইনা — ওরাই আমাকে চায়। তিনি জানালেন — চিন্তা বাইরে থেকে আসে — বিভিন্ন স্তর থেকে থেকে। তোমার মনে এখন বাইরের যে স্তর থেকে চিন্তা আসছে — তা কষ্টকর নিশ্চয়ই। বড্ড ঘোলাটে স্তর। তোমার মনের আরো উপরে ওঠা দরকার। তাতে বাইরের শুদ্ধ স্তর থেকে চিন্তা আসবে। শেষে মন যখন নিজের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে — বাইরের স্তর তার নাগাল পাবে না। তুমি চিন্তাশূন্য চৈতন্যে বাস করবে। তোমাকে উঠতে হবে।

বিনয়বাবুর ইচ্ছে ছিল জিজ্ঞেস করেন — যত উপরেই উঠি — পুরবালা-প্রাণ-প্রতিমা ওরা তো আর বেঁচে উঠবে না। ওদের সম্পর্কে শুধু দৃষ্টিভঙ্গী বদল হবে। এখন শোক করছেন — তাঁও কমে এসেছে — পরে তাও থাকবে না। তিনি যে ওদের মনে করে কষ্টপান সত্যি — তবু, ভুলতে চান না। ভুলে থাকলে নিজে হয়ত শান্তি পাবেন --- কিন্তু

এ তো স্বার্থপরের শান্তি — এ শান্তি যে স্মৃতিকে হত্যা করবার অপরাধ। তবু, শান্তির জন্যে আকাঙ্ক্ষা — শান্তি না আসবার ব্যগ্রতা — এই দুয়ের মাঝে তিনি চুপ করে রইলেন।

দীক্ষার কথা হল। ছেলে-বৌ-স্ত্রী সবাই অদীক্ষিত গেছেন। ওদের বিশেষ করে প্রাণ-প্রতিমাকে তিনি ইচ্ছে করলে দীক্ষা নেওয়াতে পারতেন — কিন্তু সমাজের ওপর রাগ করে তিনি দীক্ষা অগ্রাহ্য করলেন। এখন স্বার্থপরের মত তিনি দীক্ষা নেবেন? ওদের বঞ্চিত করে। তবু নিজেকে বোঝালেন, পুরবালা শোক পায়নি — প্রাণ সামান্যই পেয়েছে — প্রতিমা মাত্র একটি শোক — তাঁর মত এত শোক তো কেউ পায়নি? ওরা যদি স্বার্থপরের মত চলে যেতে পারে — ভগবান যদি ওদের টেনে নিতে পারেন — তবে তিনি কেন শান্তি চাইবেন না — কেন তিনি দীক্ষা নেবেন না। তবু যে ভগবান একে একে ওদের নিয়ে নিল — তারই ধ্যান-জপ? মন সায় দেয় না। সবই তাঁর লীলা — তিনি মায়ার বন্ধন কেটে দিচ্ছেন — কিন্তু দিচ্ছেন নিষ্ঠুরভাবে নির্মমভাবে — কিন্তু সেই বন্ধন ছিন্ন কি হয়েছে? প্রতি মুহূর্তে কি রক্তক্ষরণ হচ্ছে না? ভগবানকে প্রসন্ন মনে তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি কি মুক্তি চেয়েছেন? মোক্ষ? তবে কে ভগবানকে বলেছে — শোক দিয়ে তাকে মুক্ত করতে — মোহমুক্ত?

সাধককে জানালেন — কুলগুরু ছেলে-বৌমা আমাকে একই সঙ্গে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন — আমার জন্য দীক্ষা হল না। ওরা তো অদীক্ষিতই থেকে গেলেন। তিনি জানালেন — দীক্ষার সময় হওয়া চাইতো? সবারই কি দীক্ষা হয়? ক্ষেত্র প্রস্তুত চাই — ক্ষেত্র প্রস্তুত না হলে সময় কি আসে?

ক'দিন থাকলেন। আশ্রমে যাতায়াত করলেন। সাধক খুব খাতির যত্নও করলেন। পুরবালার মৃত্যুর ওপর বিয়ে করেননি জেনে অনেকক্ষণ সপ্রশংস ভাবে চোখ বুজে রইলেন।

— বিয়ে করনি — এজন্যে অনেক কষ্ট করেছ। তবু তো করনি। বিয়ে না করে অনুতাপ করেছ — কামনার তীব্র পীড়ন সহ্য করেছ। তবুও অসংযমী হওনি — আত্মসমর্পণও করনি। বিকারের হাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করেছ। এতো কম কথা নয়। বিনয়বাবু বুঝলেন এরকম বিশ্লেষণ করতে অন্তর্যামী বা দৈবজ্ঞ হতে হয় না। সাধারণ মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে ধারণা থাকলেই বলা যায়। তবু, তিনি খুশী হলেন। এই প্রথম প্রকাশ্যে একজন তাঁর কষ্ট বুঝেছেন। আর সবাই শুধু ঠুনকো প্রশংসা করেছে। কিন্তু সাধকটি হয়ত নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে বুঝেছেন। তিনি আরো আকৃষ্ট হলেন।

সাধক বললেন — স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ তোমার ইচ্ছেয় পৃথিবীতে আসেনি — তোমার ইচ্ছেয়ও যায়নি। পুত্রও তুমি একা জন্ম দাও নি। তবু দেখ, এদের তুমি নিজের মনে করে শোক পাচ্ছ। তুমি নিজেকে কর্তা ভাবছ — এই অহংকারটি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে।

তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে না — জন্মের আগে তুমি তোমার বাবা-মা'র ঘর পছন্দ করে নিয়েছ। জন্মের আগের খবর তুমি জান না — পরেরও না। সবই শোনা কথা। নিজের অভিজ্ঞতাটি কিছুই জান না। তোমার জন্ম তোমার হাতে নেই — এমনকি মৃত্যুও না — আত্মহত্যা করলেও তুমি কার্যকারণের দাসই থাকবে। তুমি বিরাট কার্যকারণের কোন এক জায়গায় একটা অবস্থায় এসেছে — একটু পরেকার অবস্থায় যাবে। নিজেকে দায়ী ভাব কেন এত?

আশ্রমের শান্ত পরিবেশ। ব্রাহ্মমুহূর্তে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ গান। সকলের মধ্যে কেমন একটা আন্তরিকতা। বিনয়বাবুকেও আশ্রমের সকলে সাদরে যেন কাছে টেনে নিল। যে শ্রদ্ধা সম্মান ও ভয় — সকলের কাছ থেকে তিনি বরাবর পেতে অভ্যস্ত — নিরাপদ দূরত্ব থেকে এতকাল সকলে তাকে শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু দূরে রেখেছে — সম্মান দিয়েছে — প্রশংসা করেছে — কিন্তু কেউ আপন করেনি। এমনকি ওর বহুকালের পুরানো চাকরটিও ওর কাছে কোন দিন মন খোলেনি — আপন হয়নি। এখানে কেমন একটা আপন আপন ভাব। অযথা কৌতূহল কারো নেই। কিন্তু সবাই তাকে দেখে খুশী হয়। হাত ধরে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যায়। গুরুদেবও হাসি ঠাট্টা করেন। মাঝে মধ্যে কথা বলতে বলতে গানও করেন। যেন সব সময় একটা আনন্দে থাকেন।

কখনও কখনও বিনয়বাবুকে নিয়েও ঠাট্টা করেন। সবার সামনেই।

— দেখ, বিনয়বাবা হাসিকে আন্দামানে পাঠিয়েছে। ও ভেবেছে চারদিকে এত লবণ জলের অশ্রু — হাসিটি দ্বীপান্তরেই দেহ রাখবে। হাসিটি মরে গেছে — সেই ভরসাই আছে। তোমার কয়েদীর কিন্তু একদিন মেয়াদ শেষ হবে। হাসি আমার বিনয়বাবার কাছে বে-আইনী। নিষিদ্ধ-হাসি গোপনে ষড়যন্ত্র করছে যে ভাই। একদিন হাসি সশস্ত্র হয়ে সন্ত্রাস শুরু করবে। ভেতরে ভেতরে যে হাসছে — তাকে হারিয়ে ফেলেছে ভেবে বিনয়বাবা অত নিশ্চিন্ত হয়ো না। এমন স্নেহের সঙ্গে বিনয়বাবুর সঙ্গে কেউ কথা বলেনি। বাবা-কাকা-কেউ নয়। সাধককে বড় ভালো লাগে।

একদা বিনযবাবু বললেন — আপনাকে ভালো লাগে। কিন্তু ঐ ভালোলাগা দিয়ে আপনাকে ছোঁয়া যায় না।

— দেখ কাণ্ড, কোথায় আমি একজন মস্ত সাধক, দু'বেলা ভগবানের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিচ্ছি-নিচ্ছি — সমাধিতে ভগবানের চাকরী করছি — নির্বিকল্প সমাধিতে একেবারে ভগবান আমাকে কনফার্ম করে নিতে যাচ্ছেন। আর বিনযবাবা কিনা আমাকে অস্পৃশ্যদের দলে ফেলে দিলেন। মহাত্মাজী একমাত্র এখন ভরসা।

সবাই হেসে ওঠেন। বিনয়বাবুও সকলের সঙ্গে হাসেন।

— এই দেখ, আমাকে অস্পৃশ্য করে তবে বিনয়বাবা হাসলেন। জাদরেল সরকারী কর্মচারী — জুনিয়ারের বিপদ ছাড়া হাসতে পারেন কখনও।

— আমার জীবনের কার্য-কারণের মধ্যে হাসির কারণ নেই — ফলে, হাসির কার্য আসবে কি করে?

—এবার বিনয়বাবা না হাসবার কেস তৈরী করবার জন্যে ফাইল ঘাটতে শুরু করবেন।

সকলের সামনে নিজের কথা বলা বিনয়বাবুর পক্ষে সম্ভব নয়। অপরের সামনে নিজের প্রসঙ্গ তুলতেও চিরকালের সঙ্কোচ। তবু, এই পরিবেশে যেন হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে জোর করেই কথাগুলো বললেন। ঐ একটি কথাই সকলের সামনে।

—বিনয়বাবা, ছেলে মেয়ে স্ত্রী—এই যে মায়ার বন্ধন—এগুলো যত দৃঢ় ভাব তত নয়। পিতা নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্যে স্ত্রী সন্তান ছেড়ে—অনাহারের মুখে ঠেলে ফেলে—অন্যনারীর সঙ্গে দিন কাটাচ্ছে। যে স্ত্রীকে স্বামী অত ভালবাসে—এক মুহূর্তের বিশ্বাসঘাতকতায় সব ভালবাসা ঘৃণায় বিদ্বেষে পরিণত হচ্ছে। পুত্র সম্পত্তির লোভে পিতার মৃত্যু কামনা করছে— বা মারবার ষড়যন্ত্র করছে। অন্য জাতে বিয়ে করবার জন্যে পিতা পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করছে—মেয়ে পতিতা হলে মুখ দেখছেনা। তুমি বলবে এগুলো সাধারণ ঘটনা নয়—অসাধারণ ঘটনা আর সাধারণ ঘটনার পার্থক্য কোথায় ? তাহলে যাকে স্নেহ-ভালবাসা বল—তা ঘটনায় পাল্টাতে পারে— পাল্টায়। বাইরের একটি ঘটনা ভালবাসাকে যখন বিদ্বেষে পরিণত করে দেয়—ভালবাসাকে উল্টে দেয়—তখন কি করে বলি, স্নেহ, ভালবাসা-যা মানুষের অন্তরে রয়েছে তা স্থায়ী জিনিস ? সাধারণ আর অসাধারণ ঘটনার পার্থক্য বাইরের ঘটনার ওপর নির্ভর করছে। যখন ঝড় হয় না—নদী শান্ত থাকে। ঝড়ে নদীর চেহারা পাল্টে যায়। নদীর স্বরূপ কি পাল্টায় ? যদি ভালবাসার—স্নেহের নিজের কোন চেহারা থাকে—বাইরের ঝড়ে অসাধারণ ঘটনায়—তা পাল্টাবে কেন ? আসলে কোন চোখে তুমি দেখছো—সব কিছু তার পরই নির্ভর করে। দৃষ্টিভঙ্গীটিই আসল। স্ত্রীর ভালবাসা যখন ছিল—তখন এক চোখে—একদৃষ্টিতে মানুষ দেখে—এমনকি স্ত্রীর অন্তরে হয়ত ভালবাসা নেই—বাইরে নিখুঁত ভালবাসার ভান করছে—তখন ঐ একদৃষ্টিতেই স্ত্রীকে দেখছে—যখন থাকছে না—বা অপর পুরুষের ওপর আকৃষ্ট বা ভালবাসার ভান ধরা পড়ে যাচ্ছে—তখন আরেক দৃষ্টিতে। পুত্র-কন্যার ওপর ভালবাসাও এক একটা দৃষ্টিভঙ্গীর দীর্ঘ-কালের অভ্যাস মাত্র। দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টালে জগতের চেহারাও পাল্টে যাচ্ছে। কোনটি আসল, জগত না, জগত সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ? আসলে জগত সম্পর্কে ধারণাও একটা দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কিছু নয়। তাও কেবলই পাল্টায়— পাল্টাচ্ছে। আবার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে ধারণাও একটা দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। মনের ভেতরেই জগত রয়েছে—তোমার দেহও তোমার ধারণা—তোমার মনও তোমার একটি ধারণা। ধারণাটিও আরেকটি ধারণা ছাড়া কিছু নয়। শেষপর্যন্ত ধারণাতে এসে আটকে যাচ্ছি। ধারণারই স্রোত চলেছে। এই ধারণাটি কে করে ? ধারণাটি কেন এল—কি জন্যে ধারণা হয় ? দরকারই যে কি ? কিছু আছে ?

এই চিন্তার কোথায় একটা ত্রুটি আছে যেন। বিনয়বাবুর মন খচখচ করে-কিন্তু ঠিক ধরতে পারেন না—আবার মানতে হয়ত পারতেন না কিন্তু মন মানবার জন্যে ব্যাকুল।

সত্যিই তো, পুরবালার মৃত্যু হয়ত একসময় শোক ছিল, পরে তা হল ক্ষতি — তারপরে? এখন তো পুরবালাকে মনেও পরে না ফটো না দেখলে? ছেলে তো কোনদিন কাছেও আসেনি — তিনি কই স্নেহবোধ করেছেন ছেলের জন্যে — কর্তব্যই করে গেছেন — হয়ত ছেলের শোকের মধ্য দিয়েই স্নেহ যে ছিল তা আবিষ্কার করতে হয়েছে। শোক শেষ পর্যন্ত একটা শূন্যতায় শেষ হল। প্রতিমার মৃত্যুতে নিষ্কৃতি ছিল, শূন্যতা ছিল-বিস্বাদ ছিল। এই দুঃখ পাওয়া — শূন্যতা বোধ করা এগুলো কি একটা যত্নে লালনপালন করা অভ্যাস মাত্র? নিয়মিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত বিনয়বাবু কি নিয়মিত শোক করাও রুটিন করে নিয়েছেন?

বিকেল হয়ে এল। আকাশ আস্তে আস্তে লাল হতে শুরু করল। পর্বতের চূড়ায় তুষার যেন এবার একটু একটু লজ্জিত। যেন এতক্ষণ পরে একটু রাঙা লজ্জার আভাস গঙ্গার জলে।

— এই যে বিনয়বাবা এল — একে কিভাবে ব্যাখ্যা করবো? পদার্থবিজ্ঞানী বলবে — অগণিত অনু পরমানুর স্তূপ এখানে এসেছে। জীববিজ্ঞানী বলবে — একটা প্রটোজয়া — বহুকোষী জৈবদেহ এখানে। আমরা বলব, বিনয়বাবা। কারোরটি কি মিথ্যে? কারোরটি কি ঠিক? ধরো যোগেন নরেনকে ঘুষি মারল — ওর তো মারপিটের দিকে বেজায় ঝোক। ও যে বাঙাল — একথা বোঝাবার জন্যেও ওকে কত ফিকিরে যে বীরপুরুষের কাজ খুঁজে বের করতে হয় — কি রে যোগেন? ঠিক না? পদার্থবিজ্ঞানী বলবে — অনুপরমাণুর একটা স্তূপ আরেকটি অনুপরমাণুর স্তূপের সংস্পর্শে এল। জীববিজ্ঞানী জানাবে, একটা জৈব দেহ ও আরেকটা জৈব দেহের মধ্যে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হল। এখন নরেন বেচারার পিঠ এ ব্যাখ্যায় সান্ত্বনা পাবে না। যোগেনের বাঙাল-মনের বাহাদুরী এতে ক্ষুণ্ন হবে, কি বলিস যোগেন? যোগেন যে নরেনকে ঘুষি দিল — এটা কি আমাদের ব্যাপার নয়? আমাদের তৈরী করা জিনিস নয়? জগতটা কি আমাদের বানানো নয়। এতো আমাদের তৈরী করা একটা অল্পকালের তাসের ঘর। তাসটা কি এতই আপন? নেশা, বাবা নেশা। নেশা নিয়ে কেউ কি জন্মায়।

বিনয়বাবুর সামনে যেন একটা জগত আস্তে আস্তে ঝাপসা ঝাপসা দেখা দিতে লাগল। যে জগতে সান্ত্বনা আছে, পরিত্রাণ আছে, বিস্মৃতি আছে। হয়ত মুক্তিও? তিনি যে শোকের মাকড়সার জাল কেবল বুনে চলছিলেন — এবার যেন তা ছিঁড়ে বের হয়ে আসবার একটা পথ দেখলেন। কেমন মনে হতে থাকল — এতদিনকার জগতটাই সব নয় — যাকে শেষ বলে ভাবছেন — তা একটা কার্যকারণের মাঝেকার অবস্থা মাত্র। একটা আশা ও ভরসাকে যেন সন্তর্পণে মনে মনে আশ্রয় দিতে চান — যদিও প্রতি সময় মনে হয় — এ টিকবে না। হয়ত সাধকের কোন দুর্বলতায় সব ভেস্তে যাবে। সাধককে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করবার জন্যে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যাচাই করতে হবে — অথচ যাচাই করতে এত ভয় হয়! কেবলই মনে হয়, বুদ্ধির, যুক্তির অগ্নি পরীক্ষায় বোধ হয় সব পুড়ে ছাই হয় — কিছুই টেকে না। আবার ভাবেন, যুক্তিই কি অগ্নিপরীক্ষার একমাত্র পথ? অন্য পথ নেই?

ঠিক এই প্রশ্নই একদিন বিকেলে সাধক তুললেন। কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই — বাবা, যুক্তিকে ক্ষুধার্ত রেখে অধ্যাত্ম সাধনা চলে না। যুক্তি জাগলে তাকে খেতে দিতে হবে না? খালি পেটে — তোমার ঐ বুদ্ধির খালি পেটে বিশ্বাস আসে না। অন্ধ বিশ্বাস আসতেও দেরী হয় না — যেতেও দেরী হয় না — মজা হচ্ছে, তাতে কোন কাজ হয় না। জীবের চোখ এসেছে অনেক পরে — সবচেয়ে দেরীতে। একেবারে কনিষ্ঠতম ইন্দ্রিয়। তাই মানুষ স্পর্শের জন্যে যত কাতর — দৃশ্যের জন্যে নয়। দেখে তৃপ্তি পায় না — স্পর্শ করতে চায় — ছুঁতে চায়। শুধু স্পর্শে কি কাজ হয় বাবা, কাকে স্পর্শ করছি — তা তো অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝা যাবে না — আর বোঝা না গেলে জানা যাবে? জানা না গেলে উপলব্ধি? অন্ধ স্পর্শের জন্যে সবাই ব্যাকুল — যুক্তিকে তাই অন্ধত্বের সমর্থনে কাজে লাগায়। একটা কিছু অনুভব ঘটল — যুক্তিতে তাঁর সমর্থন খুঁজছে। এভাবে যুক্তিকে ব্যবহার নিজের বুদ্ধিকে অপমান। যুক্তির একটা সীমা আছে — বুদ্ধিরও সীমানা আছে — সেই সীমানায় না গিয়ে যেহেতু সীমানা আছে শুনেছি — অমনি তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নিজের আলস্য ও অক্ষমতাকে ঢাকা দেওয়া একটা বড় রকমের আত্মপ্রবঞ্চনা। দৃষ্টিশক্তির মত সঠিক যুক্তি ও মনের কনিষ্ঠতম সন্তান — কিন্তু শ্রেষ্ঠসন্তান। ছোট ছেলে সবাইকে ছাড়িয়ে বড় হতে চায। বড় হয়ও। স্বাধীন যুক্তিই অন্তরের বড় সম্পদ। স্বাধীন যুক্তিই ঠিক তোমাকে পৌঁছে দেবে নিজেব সীমানার কাছে। যুক্তিকে স্বাধীন রাখা কঠিন সাধনা। কত লোভ, ভাললাগা, দুর্বলতা, অক্ষমতা যে ওকে গ্রাস করতে আসে — কত সাফাই যুক্তির ছদ্মবেশে আসে — কত সূক্ষ্ম গোড়ামি সূক্ষ্মতর যুক্তির ছদ্মবেশে আসে — এত সতর্ক থাকতে হয়! যুক্তিতে বুদ্ধি স্বাধীন হয়। যুক্তি মুক্তি নয় — মুক্তির দরজায় পৌঁছে দেয়। জ্ঞানই আদিম — জ্ঞানই অন্তিম। যিনি জ্ঞানস্বরূপ — তিনি যুক্তি বিদ্বেষী — এ কি রকম কুসংস্কার বাবা? যুক্তিপথ — যুক্তি কি দেয় — জ্ঞান? তবে তা খণ্ড জ্ঞান। বাবা, খণ্ডের উপলব্ধি না ঘটলে অখণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝবে কি করে? ওরা — এই যোগেন, নরেন, ভান্ডারকর — ওদের কি ধারণা জান বাবা? আমি হচ্ছি একটা অধ্যাত্মলিফট্ — একটা মন্ত্র দিলেই — বা আমার পা স্পর্শ করলেই — সেই লিফ্‌টে সোজা ঈশ্বরে পৌঁছে যাবে। গুরু হচ্ছে ঈশ্বরে পৌঁছে দেবার যন্ত্র। আমি একটা যন্ত্র। মন্ত্রের সুইচ টিপে দেব — ব্যাস্ — অমনি হু হু করে ঈশ্বরের বৈঠকখানায় — বা বৈকুণ্ঠখানায় সশরীরে নিয়ে হাজির হবে। সতর্ক যুক্তির বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে সন্ধান করতে হবে — ফাঁকি দিলেই ফাঁকে পড়তে হবে।

বিনয়বাবু চিরকালই যুক্তির পক্ষে। তিনি ইঞ্জিনিয়ার, কার্যকারণবোধ তার মজ্জাগত, উদ্দেশ্যহীন কিছুকে তিনি বিশ্বাস করেন না। বিজ্ঞানের দানকে তিনি কখনোই অস্বীকার করতে পারেন না। শ্রম বিনা কোন কাজ হয় না একথা অফিসের কাজে তিনি বার বার প্রমাণ করে এসেছেন — অপরের কাছে তাই প্রত্যাশাও ছিল। মুরুব্বির জোরে উন্নতি অনেকে করেছেন — তিনি সুচক্ষে, সহজভাবে তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি

নিজে খেটেছেন — অপরের কাছে তাই ছিল তাঁর দাবী। যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস, অযৌক্তিক কথাবার্তা কখনোই কোন মর্যাদা পায়নি। এমনকি, কেউ কেউ যখন অলৌকিক কাহিনী-ভারতবর্ষ এই অলৌকিক কাহিনীর দেশ — সাধুসন্ত যা পেরেছেন — বিজ্ঞান এখনও তাঁর হদিশ পায়নি — এসব নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে গড় গড় করে যারা বলে যেত — বিনয়বাবু এদের সুপারফ্লুয়াস বলে চিহ্নিত করতেন। বিজ্ঞানের এত বড অভিযান, পর্যবেক্ষণ — তথ্য বিশ্লেষণ — সিদ্ধান্ত — বহু পরীক্ষিত জেনেরালাইজেসন থিওরী — এই নির্ভুল পদ্ধতিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়াকে তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীন অজ্ঞের সিদ্ধান্ত বলেই জানতেন। চার বার শ্বাস টেনে — ষোলবার শ্বাস আটকে — আটবার শ্বাস ছেড়ে যে বলে আপেক্ষিক বাদ ও কণিকাবাদ কিছু নয় — তাকে সিরিয়াসলি নেওয়া বিনয়বাবুর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কিন্তু যুক্তির পক্ষে কথা শুনে আজ বিনয়বাবু কেমন আশ্বাস পান না। যুক্তিহীন কথা শুনলে তিনি নিশ্চয় তাঁকে আজও পছন্দ করতে পারতেন না। কিন্তু আজ যুক্তির মধ্যে খণ্ডের উপলব্ধি, আত্ম-অন্বেষণে প্রতিটি মুহূর্তে সজাগ থাকা, সদা সতর্ক তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ দিয়ে নিজের প্রতিটি অনুভূতিকে যাচাই করে দেখা — আজ বিনয়বাবুব কাছে ক্লান্তিকর — অত শ্রম, অত জোর, অতখানি আত্মবিশ্বাস যেন তিনি নিজের মধ্যে খুঁজে পান না। একটা মন্ত্রে যদি হঠাৎ মন শান্ত হয়ে যায় — মুহূর্তের স্পর্শে যদি শোক দুঃখ অনুভূতির পিপাসার জগতকে ছেড়ে একটা শান্ত আনন্দের উপলব্ধি ঘটে — তবে তাই যেন তাঁর ভেতরের কামনা। এত শোক, দুঃখ, বেদনায় যে মন ক্ষতবিক্ষত — উত্তাল শোকের বন্যায় যে মনের পাড় বার বার ভেঙ্গে পড়েছে — নির্মোহ যুক্তির প্রাসাদ সেখানে তৈরী হবে কেমন করে ? বেদনা ও ক্ষত যে মনকে আকড়ে রয়েছে — শোক ও অভাববোধ যে চেতনাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে — সেখানে সতর্ক বুদ্ধি, তীক্ষ্ম যুক্তি কি কাজ করে ? অগ্নিকাণ্ড যেখানে অহরহ ঘটছে — সেই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি আগুনকে অগ্রাহ্য করা যায় — না, আগুনের কার্যকারণ সম্পর্ক চিন্তা করা সম্ভব ? তীক্ষ্ম বেদনাবোধ নিয়ে কি নিজের সম্পর্কে নিরপেক্ষ হওয়া যায় ? নিজের বেদনা যেখানে নিজেকে টেনে রেখেছে — সেই বেদনার ব্যথার শোকের অচ্ছেদ্যবন্ধনে বদ্ধমন কি করে নিজেকে বাইরে নিয়ে আসে — নিজের অনুভূতি যদি ছাড়পত্র দিতে কিছুতেই না পারে — তবে তিনি যুক্তির জগতে — মুক্ত বুদ্ধির জগতে কি করে ঢুকবেন। তাঁর প্রবেশ পত্র কোথায় ? শোক বদ্ধই করল — মুক্ত করল কই ? যুক্তির দীর্ঘ চড়াই উৎরাই ভাঙা আজ আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই বয়েস — মনের সেই শরীরও আর নেই। প্রতিটি চিন্তার সঙ্গে যুক্তির পালোয়ানীর স্পৃহা যেন নিজের ভেতরে অনুভব করেন না। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন জীবনই যুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অশান্ত সমুদ্রের তোলপারের মধ্যে — জাহাজ ডুবি হবার মুহূর্তে সমুদ্রের ভূগোল আলোচনা চলে না। তিনি মুক্তি চান — ঐ লিফ্ট-ই চান — যদি মন্ত্রে যাদু থাকে — সেই স্থায়ী যাদুর দীর্ঘায়ু স্পর্শ চান।

পাহাড়ের পথে হাটতে হাটতে তিনি কত কি ভাবেন। তিনি তো মুক্ত নন — তিনি

রিক্ত। তিনি কিছু ত্যাগ করেননি — সবাই তাকে করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী নন, যোগী নন — তবু তাঁর সংসার নেই, স্নেহ ভালবাসার কেউ নেই। তিনি বঞ্চিত — কিন্তু বন্ধনমুক্ত তো নন। বঞ্চনার বেদনা আছে — মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কোথায়? তাঁর মধ্যে সংসার সম্পর্কে ব্যথা, শোক, অভিযোগ আছে — কিন্তু বৈরাগ্য তো নেই। বুকভরা বঞ্চনার ক্ষোভ নিয়ে তিনি সারাজীবন কাটালেন — কিন্তু বৈরাগ্য এল না কেন? জীবন তাকে চরম আঘাত দিয়েছে — তবু সেই আঘাতই তো তাঁর সম্বল — ভগবান ডাকলেন কই? ভোগে তাঁর আসক্তি নেই হয়ত — কিন্তু সংসারে তো অনাসক্তি আসেনি। কামনা পূরণও হল না — কামনার ক্ষয়ও হল না। শূন্যতা আছে, নির্বাণ নেই। এই নিঃস্বতায় কি পূর্ণতা আছে? এই শুষ্কতায় সরসতা? কি জানি?

সূর্যাস্তের লাল আকাশের দিকে তাকিয়ে যেন বিনয়বাবু পুরবালা-প্রাণ-প্রতিমাকে শেষ বিদায় দিতে চান। এই মাউন্ট আবুর পাহাড়ে আজকের সূর্যের কাছে ওদের ফেরত দিয়ে দিতে চান। ওরা সূর্যরশ্মির সংগে মিশে অস্ত যাক। আগামীকাল যেন তিনি সূর্যকে নতুন করে দেখতে চান। সেই সূর্যের বিকিরণের মধ্যে যেন কোন পুরানো আলো না থাকে, সূর্য যেন ওদের মহা আলোর জগতে পৌঁছে দিয়ে আবার নতুন করে আগামী কাল দেখা দেন। এই কাজটুকু করে দেবার জন্যে তিনি সূর্যকে সপ্রণাম অনুরোধ ও মিনতি করেন। এতটুকু কাজ এতটুকু উপকার তিনি সূর্যের কাছে চান। সন্ধ্যায় শেষ লাল আভায় পুরবালার ছবি ভেসে ওঠে — ফ্রেমে আটা ছবি। ওর কি পুনর্জন্ম হয়েছে? তাব পরেই প্রতিমা? সেই লজ্জায় নম্র ও কুণ্ঠিত হয়ে টাকা চাইতে আসবার ছবি। প্রাণের গরদের পাঞ্জাবী আর চন্দনের ফোঁটায় স্নিগ্ধ মৃত মুখটি ভেসে ওঠে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পাহাড়ের বাতাসে মিশে যায়। কিন্তু সব ছাপিয়ে অবসর নেবার দিনটি — সেই ফেয়ার ওয়েল ও চার্জ দেবার ছবিটিই বার বার মনে হানা দিতে থাকে। বিনয়বাবু আশ্রমের দিকে পা বাড়ান। যেতে যেতে অবাধ্য মন আরেক বেদনা ইতিমধ্যে এনে হাজির করল। সূর্য আকাশে নেই। বিনয়বাবু পরিত্রাণ চাইবার সম্বলও যেন মুহূর্তের মধ্যে নিজের ভেতরে অনুভব করতে পারলেন না। তাঁর শোককে কেউ বড় করে দেখে না। কারণ, বিনয়বাবুর সহ্যশক্তি অসীম — তিনি অচল, অটল। এই অচল, অটল বলে সবাই তাঁকে পাশ কাটায। শোকের 'পর শোকে তিনি যেন অভ্যস্ত। ও নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই।

সবাই তাঁর শোককে অভ্যস্ত চোখে দেখে। দেবতার আসনে বসিয়ে চিরকাল সবাই তাঁকে উপবাসী রেখেছে — বেদনার শরিক হয়নি। শোক সহ্য করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক — এই ধারণায় সকলে আশ্বস্ত হয়েছে। তিনি মানুষ হয়ে একা। সমাজে বাস করে একলা। পরিবারের মধ্যে তিনি নিঃসঙ্গ। কিন্তু এই একা, একলা আর নিঃসঙ্গতা — হয় ভগবান, নয় সূর্য ওরা সহ্য করতে পারে। তিনি পারেননি — অসহ্যকে গলাটিপে সহ্য করেছেন। দমবন্ধ হয়েছে। তবু কেউ তাকে বাতাস করেননি — কেউ পাখা হাতে স্নেহ নিয়ে পাশে দাড়িয়ে...। বিনয়বাবুর আশ্রমে পৌঁছলেন।

সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে এল। বিশুদ্ধ উচ্চারনে সামগান ভেতরে ভেতরে কেমন একটা

কম্পন জাগায়। মনে হয়, অনেক জমাট বাধা তাল তাল শক্ত পাহাড় যেন একটু একটু তরল হয়ে চোখের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দিতে চায়। মনে হয়, ঐ মন্ত্রের মধ্যে যেন অনাদিকালের একটা প্রবাহ নিজেকে প্রকাশ করছে।

স্বামিজী অনেকক্ষণ মৌন থেকে চোখ মেললেন। সোজা বিনয়বাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন — বাবা, এই আমাদের জগত-সংসার সব কিছু তো সম্বন্ধ নিয়েই। তুমি পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, পিতা, পিতামহ — এমনি করেই তো এক সম্বন্ধ থেকে আরেক সম্বন্ধে যাচ্ছ? ইলেকট্রন-প্রোটনের সম্বন্ধেই তো বস্তু বিশ্ব। বস্তু-শক্তির সম্বন্ধেই তো সব কিছু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা আজকাল চলছে। কিন্তু তুমি আসল বা সম্বন্ধটা আসল? কমপক্ষে দু'জন না থাকলে তো সম্বন্ধ হয় না। আগে তুমি, পরে সম্বন্ধ। সম্বন্ধ তো তোমার ওপর নির্ভরশীল। তোমার কোন সম্বন্ধ চলে যাচ্ছে — কোন সম্বন্ধ আবার সৃষ্টি হচ্ছে। দু'জন নারী পুরুষ দু'জায়গা থেকে এল — এসে তোমাকে জন্ম দিল। বলতে পার, তুমি সম্বন্ধের ফল। কিন্তু দু'জন বালক বালিকা কি বাচ্চাকে জন্ম দিতে পারে? একটা বয়েসে না পৌঁছালে পারে না। পারে? আমরা সম্বন্ধের মধ্যে দিয়ে আসছি — নতুন সম্বন্ধের মধ্যে যাচ্ছি। তোমার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এরাও নানা সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে এসে তোমার সম্বন্ধে পৌঁছেছিল — আজ নতুন কোন সম্বন্ধে গেছে। তা পরলোকই হোক — বা বস্তু লোকই হোক। আসলে আগে তো সম্বন্ধ নয়। দু'জন এসেই সম্বন্ধ। তাই নয়? সম্বন্ধ স্থায়ী নয় — কিন্তু তুমি? এই বস্তু জগতের সংগে সমাজের সংগে, পরিবারের সংগে, দেহের সংগে, ইন্দ্রিয়ের সংগে, মনের সংগে, দেহ-কাল-কার্যকরণের সংগে — এই সম্বন্ধের ধারা চলেছে। যেহেতু, আমরা সম্বন্ধের মধ্যে রয়েছি- .....

— আমরা তো বাবা সম্বন্ধ নই। সম্বন্ধ আমাদের আনলেও আমরা সম্বন্ধ নই। সম্বন্ধের বাইরে তোমার স্বরূপ কি? যেখানে তুমি বস্তু, প্রাণ, সমাজ, পরিবার, সংস্কার সব কিছুর বাইরে? আমরা বলব, চৈতন্যময় সত্তা। কিন্তু এই তর্কের সিদ্ধান্ত শুনে তো নিজেকে চেনা যায় না। চেনবার একটা পথ তো আছে। বাবা, সম্বন্ধের বাইরে নিজেকে না খুঁজলে এই সম্বন্ধের অত্যাচারের হাত থেকে তো রক্ষা পাবে না। নিজের একটা অস্পৃশ্য রূপ আছে — সেখানে আমরা হবিজন নই, হরিই।

পরদিন বিনয়বাবু দীক্ষা নিলেন। সামান্য হোম ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই দীক্ষার কাজ শেষ হ'ল। স্বামিজীর কাছে মনকে শান্ত ও নিস্তব্ধ করবার কতগুলো প্রক্রিয়া শিখে নিলেন। বেশ কিছু সময় তিনি যোগাভ্যাসে কাটিয়ে কেমন একটা শান্তিও পেলেন। যা এতদিনকার জীবনে একেবারে অপরিচিত। মনের প্রতিটি চিন্তাকে লক্ষ্য করতে লাগলেন — এমনি করে ঘণ্টা তিনেক নিজের সংগে একা ঘরে বসে যুদ্ধ করে চলতে লাগলেন। অফিস, প্রাণ, প্রতিমা, অফিসের ফাইল হারিয়ে যাবার জন্যে বিরক্ত, ষ্টেনো টাইপিষ্টের বানান ভুল, ছেলের মদ্যপান কত কি যে মনে আসত ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক পরে যখন সেই মনের কুরুক্ষেত্রের নীরব ও নিরপেক্ষ দর্শক হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বাইরে আসতেন — তখন সব কিছুই কেমন যেন দূরের, ঠিক আপন

নয় এমনি মনে হত। নিজের ভেতরে একটা শান্ত ভাবের রেশও।

ফেরবার সময় গুরুর একটি ফটো তুললেন। গুরুদেব জানালেন — বাবা, আমাকে নিয়ে আবার বন্ধনের সংখ্যা একটা বাড়াচ্ছো কেন ? একে সমাজবন্ধন রয়েছে — যেমন জটিল, কুটিল, তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। তারপর রয়েছে শাস্ত্রের বন্ধন — মত ও মার্গের পাহাড় প্রমাণ বোঝা — শেষে হয়ত দেখবে, গুরুও পরম সত্যের পথে একটা বাঁধা। গুরুবন্ধনও বন্ধনই। গুরুর কাজ শিষ্যকে সাবালক করা — গুরু ছাড়া চলতে শেখানো। গুরু বই কিছু জানি না — এসব ফাঁকিবাজ অলস ও ব্যাকুলতাহীনদের কথা। যতটুকু তুমি করবে — ততটুকুই তোমার হবে। আমি তোমাকে পথ বলতে পারি — সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না। এখানে তুমি একা। তোমাকে যে সম্বন্ধহীন শর্তহীন চেতনায় পৌঁছতে হবে। সেখানে আশ্রম নেই, গুরু নেই, স্থান, কাল, পাত্র কিছু নেই। বাবা, বাইরে একলা আছো, এবার অন্তরে একলা হও।

গুরুদেবের ফটো নিয়ে প্রায় দু'মাস পরে তিনি বাড়িতে ফিরলেন।

ফেববার আগের সন্ধ্যায় গুরুদেব আবার সবাইকে নিয়ে বসলেন।

— বাইরের জগত — এই ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে যে জগত আমাদের কাছে আসছে — তা কি কম বিস্ময়ের। মহাবিশ্ব জগত আর অনুপরমানুর বিশ্বজগত। মহাবিশ্ব ও অনুবিশ্ব। এক একটা গ্যালাক্সি তো এক একটা বিশ্ব। তাতে কোটি কোটি নক্ষত্র। প্রতিটি নক্ষত্রের মধ্যে চলেছে পরমানু বিস্ফোরণের ধারাবাহিকতা। একদিন প্রচণ্ড ও শেষ বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে নক্ষত্রটি মরে যাবে — আলোহীন তাপহীন একটা মরা নক্ষত্র। সুপারনোভা। আজকাল বিজ্ঞানীরা কতটা মজার কথা বলছেন, মহাবিশ্ব অসীম নয় — সসীম তবে অবাধ — মহাবিশ্ব প্রসারণশীল অর্থাৎ বেড়ে চলেছে — মহাবিশ্ব অবক্ষয়ের পথে, মহাবিশ্ব নাকি গোলাকৃতি। বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায় পর্যন্ত যাবে — তারপর সঙ্কুচিত হতে হতে প্রায় আদিম ঘন অবস্থায় ফিরে আসবে — তারপব হয়ত আবার মহা আদিম বিস্ফোরণ। আবার আরেক দল বলছে, বিস্ফোরণ নয়, বিশ্বে অহরহ নক্ষত্র জন্ম নিচ্ছে — নক্ষত্র বৃদ্ধ হয়ে মরছে। চিরকাল তাই হয়ে চলেছে। এগুলো হাইপোথেসিস। তবে অমূলক নয় — গাণিতিক। এই মহাবিশ্বে জীবন বড় একলা। এখনও বিজ্ঞানীরা অন্য গ্রহে তার সন্ধান পাননি। প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে — অন্য গ্রহে বুদ্ধিমান জীবনের সন্ধানে। মেলেনি। তাহলে সবই কি অসংখ্য আকস্মিকের খেলা ? মন তা মানতে চায় না। বিজ্ঞানীরা বলছেন — দু'টি বিপরীত শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। এই শক্তি বা এনার্জির স্বরূপ কি ? বস্তু ছাড়া তো শক্তির প্রকাশ নেই। আর বস্তু তো শক্তির ঘনীভূত অবস্থা বা বস্তুর মধ্যেই শক্তি রয়েছে। শক্তি ছাড়া কি বস্তুর অস্তিত্ব আছে ? বস্তু ছাড়া শক্তির ? তাছাড়া দেখ — বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করে চলছেন — মনকে দেহ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে — মনকে দেহে নামিয়ে আনতে — দেহকে রসায়নে — রসায়নকে পদার্থে — পদার্থকে অনুপরমানুতে। আমার দুঃখ বেদনা আনন্দ শোক কি কতগুলো গ্লাণ্ডের ফাঙসন ? অনুপরমানুর ক্রিয়া প্রতিক্রিযা। বিজ্ঞানীর এই আবিষ্কার তো তাহলে

বিজ্ঞানীর মাথার অনুপরমানুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বিজ্ঞানীর সত্য-অন্বেষণ যদি অনুপরমাণুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় তবে ধরে নিচ্ছি — অনু-পরমানুর মধ্যে রয়েছে সত্য জানবার আকাঙ্ক্ষা। প্রতিটি কণার মধ্যে রয়েছে চেতনা। মানুষের মধ্যে সেই চেতনা — আত্মসচেতন হয়ে নিজের ও বিশ্বের স্বরূপ জানতে চাচ্ছে।

গুরুদেব একটু থামলেন। কিছুটা চোখ বুজে রইলেন। আবার বললেন — সেদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল আত্মার অস্তিত্ব কি? জীবন্ত মানুষের ইন্দ্রিয় কি আত্ম সচেতন — চোখ দেখে না মন দেখে? হাত কি সচেতন? জিভ? ইন্দ্রিয় সংবাদ মনকে পৌঁছে দেয়। কতগুলো বৈদ্যুতিক কম্পন তোমার কাছে ছবি, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ — শব্দার্থ হযে যাচ্ছে। মন এগুলো গ্রহণ করছে — শোক-দুঃখ-আনন্দ প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করছে। মনও ইন্দ্রিয়। অন্তরইন্দ্রিয়। মনকে দেখে কে? তুমি তো মন নও। মনের দুঃখ যদি তুমি হতে — তবে তুমি একটা দুঃখ, একটা আনন্দ — তোমার দুঃখ, তোমার আনন্দ নয়। বুদ্ধির একটা সীমানা আছে। তার বাইরে গেলেই বিরুদ্ধ যুক্তি আসবে। তাই তোমার সাধনা মনকে ছাড়িয়ে যাওয়া — নিজেকে আবিষ্কার করা। আমরা বড় বাচাল জাত। মন আরও বাচাল। সব সময় কথা বলে চলেছে। যখন তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ থাক — মন অনর্গল কথা বলে চলেছে। আমাদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাধনা — মন নীরব করা — মনকে মৌন করা। যারা মনকে মৌন করতেন — তাদেরই মুনী বলা হত। মনকে নীরব করলেই নিজের দেখা পাবে — নিজেকে জানতে পারবে — নিজের পরিচয় পাবে। তাই এই সাধনা অন্তর্মুখীন। কতকাল মনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, লাথি গুতো খাবে? কত অত্যাচার সহ্য করবে? অত সহজে মন মরে না। যতই মন মরা হয়ে যাক। মন মরাও মনের অত্যাচার। মন তোমার মালিক নয়। মালিক তুমি। মন নিজের সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে না। মন ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট নয়। তুমি যতই মনের কাজ কর। মন তোমাকে রিটায়ার করতে দেবে না। পেনসন গ্রাচুইটি কিছু দেবে না। বাবারা, মনের বিরুদ্ধে এত কথা মনই বলল। মনই শুনল। মন অন্তর ইন্দ্রিয় নয়? ঘরে-বাইরে — বাইরে অন্তরে কত ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে থাকব। মন যদি কিছু সময়ের জন্যও নীরব হয় — একদম কথা না বলে — কোন চিন্তা ভাবনা — অনুভূতি না জানায় — তবে অল্পকালের জন্যে হলেও তুমি স্বাধীন — মুক্ত। আলাদা জগতের স্বাদ পাবে। নিজে যে চৈতন্য — তারই উপলব্ধি হবে। এ তোমাকে নিজে করতে হবে। পথ আমি বলে দিয়েছি — যেতে হবে তোমাকেই।

সেদিন বেদগানের মধ্য দিয়ে গুরুদেব আলোচনা শেষ করলেন। পরদিন বিনয়বাবুর যাবার সময় শুধু বললেন, বাবা আমার ফটো পূজা কর না। ফুল দেবে না। মালা দেবে না। আর পাঁচটা ফটোর মত আমার ফটো রাখবে। নো ভি আই পি ট্রিটমেন্ট। হেসে প্রণাম করে বিনয়বাবু বিদায় নেবার সময় শুনলেন — তাঁর আশীর্বাদ — মন জয়ী হও। দেহ রাখবার সময় হলে তোমাকে জানাব।

— এখনই কী দেহ রাখবেন। আমি আবার আসছি শীগগীরই।

— হ্যাঁ, তার আগে দেহ রাখব না।

বিনয়বাবু বিদায় নিলেন।

অবসর নেবার পর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে দেশ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। বাড়ি ফিরলেন প্রসন্ন মন নিয়ে। চারটায় উঠে সাধনায় বসতেন। ছ'টায় উঠে কতগুলো যোগ ব্যায়াম করে হাটতে বের হতেন। এই যোগ ব্যায়াম তিনি শিখেছিলেন কিশোর বয়স থেকে। কতগুলো মুদ্রাও। প্রাণায়ামও করতেন। চিরকাল করে এসেছেন। তাই বোধহয় স্বাস্থ্য তার আজও সচল। সন্ধ্যার পর আবার তিনি মনকে নীরব করবার জন্য বসতেন। প্রায় ন'টা পর্যন্ত। দশটার খবর শুনে শুয়ে পড়তেন। ঠিক করেছেন, আরও সময় দেবেন। গুরুদেব একটা কথা বার বার বলতেন — বাবা, অধ্যাত্ম সাধনা পার্ট-টাইম চাকুরী নয়। আর সাধনা আরম্ভ করবার সময় ফলের জন্যে, সিদ্ধির জন্যে ব্যাকুল হয় না। ঐ ব্যাকুলতাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

গুরুদেব বলতেন — সাধনায় মিরাকেল আশা কোরোনা তাহলে সাধনার ডিবাকেল হবে। কিছু পেতে চেয়ো না। তোমাকে হয়ে উঠতে হবে, হয়ে ওঠার সাধনাই আসল সাধনা। তুমি কি হবে? তুমি হযে উঠবে তুমিতে। তুমি, তুমি হবে। এটাই নিয়তির নির্দেশ, তাই না? নইলে তোমাকে সৃষ্টির প্রযোজন কি ছিল। সংখ্যা বাড়ানো? বংশ বিস্তার? তাহলে পশু পর্যন্ত এসে বিধাতা থেমে গেলেন না কেন? কেন আলাদা আলাদা মন দিয়ে, ব্যক্তিত্ব দিযে, আত্মসচেতনতা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, দায়িত্ব দিয়ে, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনার শক্তি দিয়ে ও আত্মচেতনা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষ তো সমাজের একটা জীবকোষ নয়, রাষ্ট্রের একটা এটম নয়। মানুষ আত্মসচেতন, আত্মপরীক্ষক, আত্মপ্রেমিক, আত্মবিদ্বেষী, আত্মপ্রতারক, আত্মগর্বী, আত্মমূর্খ। প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। প্রতিটি আধার আলাদা। মানুষ বিধাতার শেষ কথা নয় — হতে পারে না। মনকে অতিক্রম করে অভিব্যক্তির আরেকটা ধাপ মানুষকে এগুতে হবে। চৈতন্যময় সত্তায় তোমার দিব্যব্যক্তিত্ব তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। মানসিক ব্যক্তিত্ব থেকে দিব্য ব্যক্তিত্বে তুমি রূপান্তরিত হবে। এই তোমার হয়ে ওঠা — তোমার বিকামিং।

আস্তে আস্তে বিনয়বাবু বেলা নটা থেকে বারোটা — আবার ধ্যানে বসতেন। ক্রমে তাঁর উপলব্ধি হল — তাঁর ক'টা আসক্তি ঘুরে ফিরে চেতনায় আসে। ক'টা স্মৃতি অহরহ উঁকি দেয়। বেশ কিছু পরে তিনি যেন উপলব্ধি করলেন — মনের চিন্তা আর তিনি এক নন। ধ্যানের পর সমগ্র পৃথিবী যেন কেমন সুদূর মনে হত। বিনয়বাবু কোনদিনও ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ছিলেন না। আশাভঙ্গে, তীব্র আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতায় কোন কোন মানুষ বিশ্বাস হারায় অল্প কালের জন্যে। ধনী ব্যক্তিরা নিরাপত্তাহীনতায় সবচেয়ে বেশি ভোগে — ঈশ্বর বা ঈশ্বরিক শক্তির ধারাবাহিক করুণা তাদের সবচেয়ে প্রয়োজন। আর শোক মানুষ যত বেশি পায় — তত সে ঈশ্বরকে আঁকড়ে ধরে। ঈশ্বরের কাছ থেকে শান্তি চায়। বিনয়বাবু বিশ্বাসী তবে ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর অভিমান আছে — ছিল। ধ্যানের পর মন বেশ কিছুক্ষণ শান্ত থাকে। মাঝে মধ্যে সুকুমারের পড়াশুনা

দেখেন — ব্যারিস্টারের ছেলে তাই মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। খুব ভালো মাথা। ক্লাশে বরাবর ফার্স্ট হয়। এখন ইংরেজী অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে। তবে বড্ড নিরীহ — মুখচোরা, লাজুক। কোন দাবী, বায়না নেই। কেমন যেন নিস্পৃহ। ওর বাবা-মার ব্যক্তিত্ব এখনই ওর মধ্যে আশা করা ঠিক নয়। সংসারে ঢুকুক — নিজে রোজগার করুক — দায়িত্ব কর্তব্যই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। বিষ্টুই সংসার চালায়। ভালই চলছে। বিনয়বাবুর মন শান্ত হতেই মনের মধ্যে কেমন অপরাধ বোধ আসে। মনে হয়, মনে আনন্দ বা শান্তি এলে যেন পুত্রশোকের কর্তব্য থেকে তিনি বিচ্যুত হচ্ছেন। কোন আনন্দের, শান্তির অধিকার তার নেই। শুধু মৃত-দের স্মৃতিচারণা করে মন খারাপ করা ছাড়া অন্য কোন কিছু তার কর্তব্য নয়। অর্থাৎ তিনি শোক-প্রেমিক। তাছাড়া একটা আতঙ্ক সুকুমারকে নিয়েও। ও বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত তিনি অস্বস্তি — উদ্বেগে থাকেন। তিনি দুর্ভাগ্যকে বিশ্বাস করেন — ভয়ে কণ্টকিত — একথা গোপন থাকে না।

যাই হোক, শান্ত মনের আকর্ষণে, চিন্তাশূন্য মনের পিপাসায় ও নীরব মনের হাতছানিতে তিনি নিষ্ঠা ভরে সাধন সমর শুরু করেন। সত্য জানতে শক্তির দরকার। আত্মপ্রবঞ্চনা সম্পর্কে কঠোর সতর্ক থাকা প্রয়োজন। গুরুদেব বলেছেন, বাবা, বিশ্লেষণ বুদ্ধিজীবিদের একটা লোভনীয় রোগ। সময় সময় এ রোগ অশান্তির কারণ হয। সংসারে থাকবে অথচ সংসারের স্বরূপ জেনে যাবে — এটা ঠিক নয়। যাকে চিনে যাবে — জেনে যাবে — তাকে নিয়েই তো ঘর সংসার করতে হবে। সংসার সম্পর্কে উদাসীন থাক — আত্মীয় পরিজনদের বিশ্লেষণ কর না। বড দুঃখ পাবে। একটু মোহ না হলে সংসার বড্ড আলুনি। ... ধ্যানের সময় চিন্তাগুলো বিশ্লেষণ কর না। শুধু চিন্তাগুলো সম্পর্কে — সচেতন হবে — সজাগ থাকবে। এই পর্যন্ত। বিনয়বাবু যে ধ্যান-ধারণা করছেন — তা বাইরের বা বাড়ির কাউকে বললেন না। এমনকি তিনি ঠাকুর ঘরেও বসতেন না। শুধু নিজের ঘরে বিছানার পর কম্বলের আসন পেতে দরজা ভেজিযে চোখ বুজে বসে থাকতেন। তবে বিষ্টু জেনে গেল। ব্যাপারটা চাকর বাকর মহলে অজ্ঞানা রইল না। সুকুমারও বোধ হয় জেনে ছিল।

একটা স্বপ্ন তাকে মাঝে মধ্যে কেমন আত্মগ্লানি এনে দিত — অনেক দিন থেকে। স্বপ্ন দেখতেন : প্রতিমা ম্লান মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে — সেই স্বল্প ঘোমটা — চোখ নত করে ঘরে ঢুকবার মিনতি নীরবে জানাচ্ছে। তিনি প্রচণ্ড বিব্রত। তিনি চান না কিছুতেই প্রতিমা ঘরে প্রবেশ করুক। তিনি কীভাবে নিষেধ করবেন বুঝতে পারেন না। প্রবল অপরাধবোধ নিয়ে ঘুম ভাঙবার মুখে তিনি দেখতেন পুরবালার ও ছেলের ফটো। দু'জনের ফটো দু'টো দেখবার পরই ঘুমটা পুরোপুরি ভেঙে যেত। আর ঘুম আসতে চাইত না। বয়েস হলে ঘুম কমে যায় — মনের জোর কমে যায় — ঘুম ঘুম তন্দ্রা তন্দ্রা ভাবে তাঁর মনে হত — মনের শক্তি কমে যাচ্ছে — কতদিন আর প্রতিমাকে ঢুকতে না দিয়ে পারবেন। আবার কোন কোন দিন — তিনি দরজার গোড়ায় প্রতিমাকে দেখে দারুণ চমকে যেতেন — একী, প্রতিমা এল কি করে। আমি স্পষ্ট জানি, নিশ্চিত

জানি, প্রতিমা মরে গেছে। প্রতিমা যে মরে গেছে একথা তিনি প্রতিমাকে বলতে পারছেন না। বললেই প্রতিমা দারুণ ব্যথা পাবে। বললে ওকে আঘাত দেয়া হবে। বিধবা বৌমাকে আর তিনি কষ্ট দিতে চান না। মেয়েটা অনেক কষ্ট পেয়েছে। অথচ ঘরে তিনি ঢুকতে দিতে পারেন না। প্রতিমা কেন বুঝতে পারছে না — ও নেই। কিন্তু এলো কি করে? প্রতিমা জীবিত হল কি করে? ও যে নেই — একথা কেন ওর জানা নেই? তিনি ঠিক জানেন প্রতিমা মরে গেছেন। শ্মশানের ছবি দেখেছেন। সুকুমারকে দিয়ে শ্রাদ্ধ করিয়েছেন। তবে এখানে এল কী করে? স্বপ্নের মধ্যে বিনয়বাবু বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যেতেন। ঘুম ভাঙার মুখে আবার পুরবালার ও ছেলের ফটো দুটো ভেসে উঠত। ঘুম ভেঙে যেত। সেদিন লজ্জায় তিনি পুরবালা ও ছেলের ফটোর দিকে তাকাতে পারতেন না। বিকেলের দিকে তিনি যেন ফটো দুটোর দিকে না তাকিয়ে ফটো দুটোকে আবেদন করতেন: জেগে থাকা কালে ঘন্টার পর ঘন্টা তোমাদের ফটোর দিকে তাকিয়ে থাকি — তোমরা যখন বেঁচেছিলে আমার ফটোর দিকে কতটুকু তাকিয়েছ — আমার কোন ফটো তো তোমাদের কাছে ছিলই না, এমনিতেও আমার দিকে কতটুকু তাকিয়েছ — না ফটোতে, না এমনিতে, আমার দিকে কতটুকু তাকিয়েছ? আমি কত বছর তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকি — রোজ রোজ কত ঘন্টা করে। আর তোমরা আমার স্বপ্নে এস না। স্বপ্নটাকে তোমরা একটু স্বাধীনতা দাও। স্বপ্ন যেন জীবনের নকল না হয়।

তবু স্বপ্নের কথা মনে এলে কেমন যেন একটা আত্মগ্লানি, একটা অপরাধবোধ ভোরের দিকে অনেকক্ষণ থাকত। কিন্তু ধ্যান আরম্ভ করবার পর স্বপ্নটা প্রথম দিকে বেশ কমে গেল। তারপর বহুদিন দেখেননি — কদাচ দু'একবার ছাড়া।

মাসছয়েক পর তিনি আবার গুরুদেবের কাছে এলেন। গুরুদেবের ঘরটা বড় একটা ঘরের আকারে গুহার মত তৈরী করে দিলেন। নাট মন্দিরও একটা তৈরী করে দিলেন। গুরুদেব যে খুব খুশী হলেন তা নয়। বললেন — সাধকদের একটা লোটা কম্বল আর দু'বেলার মত ক'টা রুটি — এর বেশি কিছু দরকার হয় না। আর যদি বাড়াতে চাও — তবে তার কোন শেষ নেই। বাইরের আড়ম্বর যত বাড়বে — ভিতরের সম্বল তত কমবে। তোমাকে ওরা লোভের চোখে দেখতে আরম্ভ করবে। বাবা, ওদের এমনিতেই তো কিছু হয় না — তারপর ওদের লোভী হবার পথ দেখিও না। আর আমার কথা, পূর্বাশ্রমেও আমি দরিদ্র শিক্ষক ছিলাম। দারিদ্রেও আমার জন্মগত অধিকার।

বিনয়বাবু জানতেন গুরুদেব ফিজিক্স ও ফিলজফিতে এম.এস.সি ও এম.এ. এবং কলেজে পড়াতেন। আর কিছু জানতে পারেন নি। তবে অতীব সুপুরুষ ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও ইংরেজী শুনে ঠিক বাঙ্গালী মনে হত না।

সেদিন বিকেলে আলোচনায় একজন প্রশ্ন করলেন — সবাইতো ঈশ্বর মানে, ব্রত, উপবাস, পূজো করে, তীর্থে যায় — কিন্তু মনে শান্তি আসে না কেন? খুব শান্তস্বরে গুরুদেব জানালেন — কেউ ঈশ্বর মানে না — সবাই নাস্তিক। তবে তারা যে ঈশ্বর

মানে না — তারা যে নাস্তিক — একথা তারা জানে না। তাছাড়া 'ঈশ্বর মানে' এ কথাটির অর্থ কি? ঈশ্বর আছেন তা স্বীকার করেন। তুমি গুরুজনদের মাননা। অর্থাৎ তোমার গুরুজন আছে — কিন্তু তাদের অভিভাবকত্বে তোমার আপত্তি আছে। অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন কিন্তু তার বিধান আমি মানি না। যারা বলেন, মানি বা মানি না — কথাটি কেউ ঠিক প্রয়োগ করে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা বলা যাচ্ছে ঈশ্বরকে 'মানা'। 'মানা' শব্দটি এখানে চলে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যারা স্বীকার করেন না — তারা নাস্তিক। আমি বলছি — প্রায় অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না অবচেতন মনে। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে তবে সেই বিশ্বাস থেকে আসে নির্ভরতা। আর নির্ভরতা থাকলে তার মধ্যে কোন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, শোক কিছু আসতে পারে না। কারণ বিশ্বাস আর নির্ভরতাকে এক কথায় বলা যায় আন্তরিক আত্মসমর্পণ। এই আন্তরিক আত্মসমর্পণ যখন ভিতর থেকে জেগে ওঠে — তখন বলতে পারি, লোকটার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। ছেলেবেলা থেকে বাবা, মা, গুরুজনদের কাছে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনি — তার কাছে চাইলে সব পাওয়া যায়। তাই ঈশ্বরের ধারণা একটা আরোপিত সংস্কার। তাই লোভে, ভয়ে, মানত করি — এতে যে ঈশ্বরের ধারণাকে অপমান করা হয় তাও বুঝি না। যার মধ্যে নিরাপত্তার যত অভাব — তার তত ঈশ্বরকে প্রয়োজন, তত অলৌকিক প্রাপ্তির প্রয়োজন। যার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে — তার ভয়, নিরাপত্তার অভাববোধ, প্রতিহিংসা নেবার ক্ষমতার অভাবের জন্যে ঈশ্বরের কাছে নালিশ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে আবেদন ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এমন লোক ক'জন আছে? আগে নিজেকে চেন — নিজেকে খোঁজ। তাহলেই ঈশ্বরের খোঁজ পাবে। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে যে ঈশ্বরের সংস্কার জন্মে যায় তাই সত্য অন্বেষণের বড় বাধা। বাবারা, দয়া করে আর ঈশ্বরের নাম কর না। আগে ঈশ্বরের ধারণাটি পরিষ্কার কর — নিজের ভেতরে অন্বেষণের তৃষ্ণা আন্তরিক করে তোল। মনকে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তায় অভ্যস্ত কর। সর্বশেষে মনের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা আরম্ভ কর। তাহলেই শান্তির পথে যাত্রা শুরু হবে।

— বাবারা, তোমাদের কাছে প্রায়ই শুনি, এ লাইনে এলেই তবে ঈশ্বরের করুণা পাওয়া যায়। এ লাইন মানে আধ্যাত্মিক লাইন — আধ্যাত্মিক লাইনে ঈশ্বরের রিলিফ ট্রেন এলে তোমরা কৃপা অনুদান পাবে। এ সব ছবির ভাষা যত কম ব্যবহার করবে তত চিন্তা পরিষ্কার হবে। যুক্তির ভাষা আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর। ধ্যান করবার সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু যুক্তি দিয়ে চিন্তা করবার অভ্যাস কর। মনে যা আসে তাই ভাবব — মোহ সেই ভাবনা ধরিয়ে দেয় — সেই ভাবনায় কষ্ট পাব — মনের এ দাসত্ব আর কতকাল? নিজে যুক্তি দিয়ে ভাববার চেষ্টা কর। প্রতিটি ধারণাকে যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা কর। কীর্তন করা সহজ, সংকীর্তন আরো সহজ। কিন্তু যুক্তিশীল হওয়া তত সহজ নয়। মনের যা দান তা গ্রহণ কর — মনকে সক্রিয় কর — বিচার বিশ্লেষণ কর — যতটা পার। তারপর সেই সমৃদ্ধ মনকে বিসর্জন দেবার জন্য ধ্যানে বসো। সেদিন গুরুদেব এখানেই থেমে গেলেন। তারপর বেদগান দিয়ে আসর শেষ হল।

যাবার আগে বিনয়বাবু একা দেখা করতে গেলে বললেন — বাবা, শোক-প্রেমিক হয়ো না। শোকনিষ্ঠ হয়ো না। তোমার ইচ্ছায় কেউ মরেনি। স্মৃতির জগতে কত পায়চারী করবে। বিস্মৃতির জগতেও মর্নিংওয়াক কর। তারপর থেমে বললেন, কুম্ভমেলা এ বছর হবে — এস — একসঙ্গে যাব। একটা সাব্লাইম অপচয় দেখতে পাবে। আমাদের দেশের মানুষ অন্তরে অন্তরে কী পরিমাণ দুর্বল — তার একটা বিশাল সবল জীবন্ত চিত্র পাবে। বিনয়বাবু যে কয়েকবার কুম্ভমেলায় গেছেন তা আর বললেন না।

বলি বলি করেও স্বপ্নের কথাটা তিনি গুরুদেবকে বলতে পারলেন না। কেমন মনে হতে থাকল, এতে প্রতিমাকে ক্ষুণ্ন করা হবে। প্রতিমাকে অপমান করা হবে। একে তো ও যে মরে গেছে একথা মনে এনে ওকে ম্লান করে দিয়েছেন। এখন গুরুদেবকে বললে যেন ওকে তাড়িয়ে দেবার একটা নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র হবে। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা কুণ্ঠিত, লজ্জিত, নম্র, বিনীত মুখখানির নীরব উপস্থিতিকে যেন চিৎকার করে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। তাই প্রাণ ধরে স্বপ্নের কথাটি তিনি গুরুদেবকে বলতে পারলেন না। হোক আত্মগ্লানি। কই, স্বপ্নে পুরবালা তো আসেনি — ছেলেও কখনো আসে না। প্রতিমা শুধু একা আসে। ফটোগুলোর আপত্তি আছে। প্রতিমা না এলে ফটো দুটোও স্বপ্নে আসে না।

ঘরের পুত্রবধূকে কোনমতেই প্রকাশ্যে আলোচনার বিষয় করতে পারবেন না। জীবনে এত শোক পেয়েছেন — না হয় আত্মগ্লানি আরেকটু সহ্য করবেন। তাছাড়া প্রতিমার মৃত্যুতে যে নিষ্কৃতি পাবার, রেহাই পাবার একটা মুক্তি তিনি অনুভব করেছিলেন — তাতে প্রতিমার স্মৃতির প্রতি তিনি কি অবিচার করেননি। প্রতিমার কোন ফটো তিনি ঘরে রাখেননি। সুকুমারের ঘরে প্রতিমার একটা বড় ফটো আছে। অবশ্য কালেভদ্রেই তিনি সুকুমারের ঘরে যান। যাবার সময় গুরুদেবকে প্রণাম করবার পর তিনি আশীর্বাদ করে বললেন — সব কথা কাউকে বলা যায় না। কারণ মানুষ সচেতন ভাবে ভাবনাগুলোকে যা ভাবে, অনেক সময়ই ভাবনাগুলোর প্রকৃতি তা নয়। অন্ধকার অন্তর থেকে যে ভাবনাগুলো চেতনার আলোতে আসে — অনেক সময় আলো তার রূপ বদলে দেয়। নিজেকে মানুষ কতটুকু জানে। বহু সময়ই মানুষ অযথা দুঃখ পায়। মন বেদনাকে নিংড়ে নিংড়ে এক রকম রস পায়। ওই রসে নেশা হয়। বেদনার নেশাও শক্ত নেশা। তবু তা ছাড়া যায়। বেদনার আনন্দ থেকেও মুক্ত করতে হবে নিজেকে।

বহুকাল বাড়ি ছাড়া — ফিরতে ফিরতে সুকুমারকে দেখবার একটা ক্ষিদে বোধ করেন। গুরুদেবের জন্যে, আশ্রমের জন্য নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি গুহা ও ঘর, জলের স্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সময় ও অর্থ একটা সৎ কাজে ব্যয় হল বলে মনের মধ্যে একটা প্রশান্তিও এসেছে। তবু বাড়ির জন্যে মন কেমন করে। তবে এত কাজ সত্ত্বেও বহুরাত পর্যন্ত তিনি ধ্যান করেছেন। মন আগের চেয়ে অনেক শান্ত। প্রতিমা একদিনও স্বপ্নে আসেনি। তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না — স্বপ্নের প্রতিমার অনুপস্থিতিতে তিনি আশান্বিত না আশাভঙ্গ ?

মৃত মানুষের স্মৃতিতে, মৃত মানুষদের জন্যে শোকের দীর্ঘনিঃশ্বাসে যে ঘরের বাতাস অতীতমুখী, যে ঘরের জানলা দিয়ে পুরানো বেদনার্ত বর্ষার জলের ধারা উঁকি দেয় — যে ঘরের বাইরে রয়েছে দমবন্ধ করা মরা আকাশ, যে ঘরে জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর বেমানান, যে ঘরে শ্মশানের স্তব্ধতা স্থায়ী আসন পেতে বসেছে — সেই ঘর থেকে বেশ কিছুকাল বাইরে থাকতে পেয়ে বিনয়বাবু যেন বহুকাল পরে নিজের স্বাভাবিক পুরানো চেহারা দেখতে পেলেন — যে চেহারা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন। এতকাল পর যেন নিজেকে মনে পড়ল। নিজের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্বাদ বদল অনুভব করলেন। মন্দিরের কনস্ট্রাকসনের কজের মধ্যে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সত্তাকে ঘুম থেকে যেন ডেকে তুললেন। গুরুদেবের আলোচনা, মন্দিরের কাজ, রাতের ধ্যান তাকে ভিন্ন এক জগতের স্বাদ এনে দিল। পার্বত্য পরিবেশ, অরণ্যের হাতছানি, গুরুভাইদের উচ্ছলতায় তিনি যেন বেঁচে থাকবার একটা স্বীকৃতি পেলেন। বেঁচে থাকবার লজ্জা ও গ্লানি অনেকটা যেন চাপা পড়ে গেল। কিন্তু যখন রওনা হলেন আশ্রয় থেকে — গুরুভাইরা যখন তাকে তুলে দিতে এল — তখন যতটা ব্যথাতুর হবেন ভেবেছিলেন — ততটা হলেন না। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন শুধু সুকুমারের জন্যে নয় — ঐ মৃতফটো কণ্টকিত ঘর — ঐ নিরাশায় দমবন্ধ করা ঘর তাকে ক্রমাগত আকর্ষণ করছে। ঐ ঘরের নেশা — হয়ত বেদনার নেশাই — শোকনিষ্ঠতাই তাঁর ভিতরে বাড়ি ফেরবার একটা মুখচোরা আকর্ষণ ক্রমাগত তাকে পীড়ন করছিল। আধা প্রেতলোকের ঐ কয়েদখানায় বাইরে থাকার একটা সূক্ষ্ম গ্লানি যে একটা অধীর আকর্ষণ হয়ে তাকে ঘরমুখো করবার জন্যে ভিতরে ভিতরে চাপ দিচ্ছিল — ট্রেনে উঠে তা টের পেলেন।

বাড়িতে এসে দেখলেন সবই ঠিক আছে। বাড়ির আসল গার্জিয়ান বিষ্টু ঠিক সংসার চালিয়ে নিয়েছে। সুকুমার প্রণাম করে দাঁড়াল। চাকর বাকররা এসে প্রণাম করে গেল। সুকুমার জানাল, পড়াশুনা ঠিক চলছে। তবে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া উচিত — তবে সাহিত্যতো পরীক্ষককের সাবজেক্টিভ সাইডটা অগ্রাহ্য করবার মতন নয়। বিনয়বাবু জানালেন, চেষ্টা কর। ফল অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। সুকুমার চলে যায়। নিজের ছেলে কদাচ তার কাছে আসত। শুধু দূর থেকে খবরাখবর নিত। বিনয়বাবুও কি বাবার সঙ্গে বসে গল্প করেছেন। শুধু মাথা নিচু করে প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েছেন। এই ছিল তৎকালীন রীতি। সুকুমার মাঝে মধ্যে আসে — তবে একটা আড়ষ্টভাব আছে। ঘরের ফটোগুলোর জন্য একটা বিরহভাব ছিল — ফটোর দিকে তাকিয়েই বুঝলেন। যেন এদের এতকাল তিনি নিজের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করে উপবাসে রেখেছেন। তিনি ছাড়া ওদের কেউ নেই। কেউ ওদের এত ঘনিষ্ঠভাবে জানে না। শোকনিষ্ঠ তিনি। শোক প্রেমিক তিনি। তবু পুরানো ঘরে এসে কিছুকালের জন্যে হারিয়ে যাওয়া চেহারা ফিরে পেয়ে যেন তিনি নিজের চেনা জগতে প্রবেশ করলেন। অল্পকালের জন্যে বাইরে ছিলেন — অল্পকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আবার তিনি স্বক্ষেত্রে। ফটোরা অভিমান করে আছে। একটু পরেই খুশী হয়ে উঠবে।

ক'দিন পর থেকেই আশ্রমের খোলা হাওয়া, হাসিখুশি পরিবেশ, জ্ঞানদীপ্ত গুরুদেবের উপদেশ কেমন যেন উন্মনা করে দেয়। বিস্মৃতির মধ্যে তখন মর্নিং ওয়াক করতে পারলেন না। তবে জীবিত ও মৃতলোকের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করলেন। ধ্যানও বেশ গভীর হতে শুরু করল। মন বেশ কিছুটা শান্ত হল। তবে সন্ধ্যায় সুকুমার ঘরে না ফেরা পর্যন্ত উদ্বেগটা এখনও রয়েছে। ভেতরে ভেতরে সুকুমারের জন্যে একটা আশঙ্কা তিনি চাপা দিতে পারেন না। কতবার নিজেকে বোঝান, কই যখন আশ্রমে ছিলেন তখন উৎকণ্ঠা তো বিকেলে বোধ করতেন না। কিন্তু একথাও তিনি নিজের কাছে গোপন রাখতে পারেননি। আশ্রমে মাঝে মধ্যে একটা ভয় কদাচিৎ উঁকি দিত: কলকাতা থেকে সুকুমারের জন্যে কোন টেলিগ্রাফ এসে হাজির না হয়— কোন দুঃসংবাদ বহন করে। বুঝিয়েছেন, এবার গুরুদেবের আশ্রয়ে রয়েছেন— এখন তিনি গুরু-আশ্রিত— এখন ভয় কিসের। তবু একটা টেলিগ্রাফের ভয় তো একেবারে কাটেনি।

কুম্ভমেলায় যাবার আহ্বান পত্র এসে হাজির হল। তিনি বিষ্টুকে সংসারের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সুকুমারের প্রণাম গ্রহণ করে, সুকুমারের জন্যে উদ্বেগটাকে যথাসম্ভব চাপা দিয়ে হাওড়ায় ট্রেনে চাপলেন। যথা সময়ে আশ্রমে এসে পৌঁছে তিনি একান্ত ভাবে গুরুদেবের কাছে একা একদিন বসলেন। রওনা হতে আরও দিন সাতেক। গুরদেব দেখেই বললেন— অনেকটা এগিয়েছো। আসলে সারাজীবন প্রায় যৌন-উপবাস করেছ— সংযম তো তোমার স্বভাব হয়ে গেছে। দু'এক মুহূর্তের জন্য হলেও মনটা একদম চুপ হয়েছে তো?

— ঐ দু'একমুহূর্তের জন্যেই বারকয়েক মাত্র।

— ঠিক আছে। একদম নীরব হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ো না। ঐ ব্যাকুলতা ক্ষতি করে।

— আচ্ছা গুরুদেব, আপনি বলেছেন দেহ রাখবার আগে আমাকে জানাবেন। দেহ কি আপনি স্বেচ্ছায় ছাড়বেন, না ছাড়তে বাধ্য হবেন?

— স্বেচ্ছায় নয়।

তাহলে দেহের ছাড়বার সংবাদ আপনি কি করে জানাবেন?

— তাই যদি না পারি তবে একাল কি করলাম? এটুকু পারব না?

— আমি আর কোন শোক পাব না তো? বংশ থাকবে তো?

— কোন শোক তুমি পাবেনা। বংশ তোমার থাকবে।

গুরুদেবকে প্রণাম করে সেদিনের মত বিদায় নিলেন। সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ টিকিট কেটে কোথাও যায় না। বিনয়বাবু বললেন, একটা কামরা রিজার্ভ করে রাখতে। তিনি অর্থ দেবেন। সবাই খুশী হলেন। অন্ততঃ গুরুর সান্নিধ্যতো সবসময়টা পাবেন। ইতিমধ্যে একদিন গুরুদেব জানালেন বিনয়বাবুকে, হরিদ্বার থেকে ফিরে এসে তিনি আশ্রমের ট্রাষ্টিবোর্ডে বিনয়বাবুকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। আইনের প্রয়োজনে বিনয়বাবুকে আবার আশ্রমে ফিরে আসতে হবে। গুরুদেব জানালেন— বাবা, জানি তোমার আপত্তি

আছে — কিন্তু আশ্রমের প্রয়োজন — এদের মধ্যে ক'জন ত্যাগী বলতে পার — অধিকাংশই রিক্ত, অধিকাংশই অন্তরে অন্তরে ভিখিরি — বাইরে গেরুয়া ইউনিফর্ম পরে সন্ন্যাসী। এদিকে রিজারভেশন হয়ে গেছে। ট্রেন ছাড়বে বেলা একটায়। স্টেশনমাস্টার মশায়ও গুরুদেবের অনুরাগী। প্রায়ই আসেন গুরুদেবের কাছে। কোনদিকে কোন অসুবিধাই হল না।

যাবার দিন আগের রাত — তখন তিনটা। হঠাৎ একজন গুরুভাই এসে বিনয়বাবুকে ডাকলেন। গুরুদেব ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন।

বিনয়বাবু এসে দেখলেন পরমশান্তিতে গুরুদেব নিদ্রিত। আশ্রমের ভক্তদের মধ্যে একজন ডাক্তার আছেন এবং হরিদ্বাব যাবার জন্য আরেকজন বড় ডাক্তারও আশ্রমে এসেছেন। দু'জনেই বললেন — ঘণ্টা তিনেক আগে মারা গেছেন। কার্ডিয়াক এরেষ্ট।

গুরুভাইদের একাংশ জানাল, এটা মৃত্যু নয় — নির্বিকল্প সমাধি। শ্বাস, প্রশ্বাস, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ থাকে। সুতরাং আরো কি অন্ততঃ বার ঘণ্টা না দেখে কিছু বলা যাবে না। মৃত্যু ঘোষণা স্থগিত রাখলেন। একজন গুরুভাই বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন — গুরুদেব তো কয়েক বারই আপনাকে দেহ রাখবার আগে জানাবেন বলেছিলেন। নিশ্চয়ই কিছু জানাননি। তাহলে আপনি আমাদের বলতেন। তাছাড়া, গুরুদেব তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, দেহ রাখবার আগে জানিয়ে যাবেন।

সাবা আশ্রমে একটা বিষণ্ণ মৌনতা নেমে এল। টিকিট ফেরত দিতে একজন চলে গেল। পরদিন বেলা একটার সময় শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার এলেন। তিন জন ডাক্তারই ঘোষণা করলেন, মৃত্যু। বডি ডিকম্পোজ হতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যায় গুরুদেবকে সমাহিত করা হল আশ্রমের বাগানের মধ্যে।

বহু শিষ্য বাচ্চা ছেলেদের মত কাঁদলেন। উপনিষদের মন্ত্র সুর করে পাঠ আরম্ভ হল। বেদগানের মধ্য দিয়ে সমাধি পর্ব শেষ হল। এবার গুরুদেব সম্পর্কে আশ্রম থেকে একদিকে বলা হল : গুরুদেব ঠিকই দেহ রাখবার কথা বলেছিলেন সাংকেতিক ভাবে। আমরা বুঝতে পারি কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে। আমরা পারিনি। হরিদ্বারে যাবেন অর্থাৎ হরির কাছে বৈকুণ্ঠে যাবেন। বৈকুণ্ঠেব দরজায়। অর্থাৎ হরিদ্বার-এ। অমৃতকুম্ভে অর্থাৎ কুম্ভ থেকে যে অমৃত উঠেছিল, সেই অমৃতলোকে — দেবলোকে। আমরা স্থূল অর্থ করেছিলাম। গুরুদেব আমাদের বোকা বানিয়ে চলে গেলেন। যারা বলেছিল, নির্বিকল্প সমাধি — মৃত্যু নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, গুরুদেব নাকি তাদের গোপনে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, আশ্রমের সিংহাসনে বসবার জন্যে ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে ক্ষমতার লড়াই শুরু হল। দু'পক্ষই বিনয়বাবুকে দলে টানবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

যে ছেলেটি গুরুদেবের মৃত্যু প্রথমে বুঝতে পাবে — সে বিনয়বাবুকে জানায় : রাত দুটো থেকে ছেলেটি ধ্যান করেন — গুরুদেব ওঠেন তিনটায়। ছেলেটি মুখটুকু ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ধ্যান করতে বসতে গিয়ে লক্ষ্য করল — গুরুদেবের শ্বাস প্রশ্বাসের কোন

শব্দ নেই। যেই শব্দের সঙ্গে ছেলেটি দু বছরের ওপর পরিচিত। কাছে এসে দেখলেন নিঃশ্বাস নেই — বুকে কান পেতে দেখলেন — কোন শব্দ নেই। হাত-পা ঠাণ্ডা। বার কয়েক গুরুদেবকে ডাকলেন — ঠেলা দিলেন। প্রচণ্ড ভয় হল। তখন তিনি প্রবীন শিষ্যকে খবর দিলেন। তিনি ডাক্তার-ভাইদের খবর দিতে বললেন। আরও দু'জনকে ডেকে আনতে বললেন। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বললেন — ডাক্তারী শাস্ত্র মতে গুরুদেবের দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। তাও প্রায় তিনঘণ্টা হল। সবাই স্তম্ভিত — বজ্রাহত। প্রবীণ শিষ্যটি বললেন, নির্বিকল্প সমাধিও হতে পারে। তবে যদি ব্রহ্মস্থিতি লাভ করে থাকেন — তবে হয়ত গুরুদেব আর ফিরবেন না।

ভাণ্ডারা হবার পরদিন সন্ধ্যার ট্রেনে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিনয়বাবু আশ্রম থেকে বিদায় নিলেন। বের হবার সময় গুরুদেবের সমাধির সময়টার চিত্র ভেসে উঠছিল। শহর ভেঙ্গে লোক এসেছিল। সবাই শুনল — গুরুদেব নির্বিকল্প সমাধির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেছেন। আজ একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ মুহূর্ত। গুরুদেবকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। বিনয়বাবুর বার বার ছেলের মৃত্যুর দৃশ্য মনে পড়ছিল। এত না হলেও কম ভীড় ছিল না। বিনয়বাবুর একটি কথাই বার বার মনে হচ্ছিল। আমাকে ভালবাসলে সে কখনো বাঁচে না। যত বড় মহাপুরুষই হোন।

ট্রেনে যেতে যেতে বাইরের চলমান দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকেন। হরিদ্বার, বৈকুণ্ঠের দরজা, অমৃত লোক, নির্বিকল্প সমাধি, ব্রহ্মস্থিতি — এসব কথা বলবার কি প্রয়োজন? তিনি তো অনেকের সামনেই বলেছিলেন, কুম্ভমেলা থেকে ফিরে এসে তাকে আশ্রমের ট্রাষ্টী বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন। হরিদ্বার যাবার কথায় কোন দ্ব্যর্থবোধক অর্থ ছিল না। কোন স্থূল অর্থ ছিল না। গুরুদেব চলে যেতেই গুরুভাইদের গেরুয়ার ইউনিফর্মের ভেতরের হিংস্র ভিখিরিগুলো বেরিয়ে পড়েছে। ভাণ্ডারার দিন যত ভিখিরি এসেছিল — তারা অনেকে সৎ ও আন্তরিক — ঐ গেরুয়াধারী, অন্তরে রিক্ত, বাহ্যক্ষমতালোভী ঐ ভিখিরিদের চেয়ে। একটা ব্যাপার তিনি কিছুতেই বুঝতে পারেন না — গুরুদেব এত জ্ঞানী, মানুষের মন বুঝবার এত ক্ষমতা, এত বড় যুক্তিবাদী, এত ধ্যান-অভিজ্ঞ সাধক — তিনি কেন বলতে গেলেন, দেহ রাখবার আগে জানাব — নিজের অলৌকিক শক্তির প্রতি এই মোহ বা ডিলুউসন কেন? নিজেই তো বলতেন, মিরাকেল চাইলে ডিবাকেল হয়। তারও কি ডিবাকেল হল না? কেন এই দুর্বলতা? অনেকের সামনে বার বার একথা কেন? ফিরে এসে তাকে যে ট্রাষ্টি বোর্ডের মেম্বার করবেন — সে সম্পর্কে কেউ উচ্চবাচ্য করেননি বলে বিনয়বাবু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

গুরুদেবকে বারবার মনে হয়েছে — যতবার দেখেছেন ততবারই মনে হয়েছে — একটা নিঃসঙ্গতার গর্ব ঐ লোকটির মধ্যে রয়েছে। আর বিনয়বাবুর মধ্যে রয়েছে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা — একাকীত্বের শূন্যতা। শূন্যতার যন্ত্রণা তিনি বহন করে চলেছেন নীরবে নিভৃতে। গুরুদেব তার শূন্যতাকে বুঝতেন। বোধহয় একমাত্র মানুষ

যিনি বিনয়বাবুকে বুঝতেন। এত সহানুভূতি দিয়ে তাকে কেউ কোনদিন বোঝেনি। জীবনে এই প্রথম একজন দরদী পেয়েছিলেন। তাঁর ভালবাসার লোক বলেই কি গুরুদেব মরলেন। তাঁর অভিশপ্ত কপালের জন্যে? গুরুদেব বলেছিলেন, কোন শোক আর পাবেন না তিনি। শোক নয়, দুঃখ নয়— কেমন একটা অন্ধকার বিষণ্নতায় মন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

গুরুদেবের মৃত্যুতে ঘরে আরেকটি মৃতের ফটো বাড়ল। আগে ছিল দুটি জীবন্ত ফটো তাঁর ও গুরুদেবের। এবার ঘরে মৃতফটোদের মধ্যে একা তিনি—আর তাঁর ফটো। গুরুদেব ফটো তুলবার সময় বলেছিলেন: ফটোকে যেন কোন ভি. আই. পি. ট্রিটমেন্ট না করা হয়। তবু ক'দিন তিনি গুরুদেবের ফটোতে ফুলের মালা দিলেন—ধূপ জ্বেলে দিলেন।

গুরুদেবের মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হল ধ্যানের। কেমন যেন মন বসাতে পারেন না। ধ্যানে আগের মত আকর্ষণও নেই। নিয়ম করে বসেন কিন্তু যতটা অগ্রসর হয়েছিলেন—তার ধারে কাছেও যেতে পারলেন না। যে শান্তি পেতেন তা আর পেলেন না। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন, ধ্যানের ওপর, ধর্মের ওপর একটা সূক্ষ্ম অবিশ্বাস নীরবে সক্রিয়। ধ্যানের জগতে নিজেকে না পারলেন উদ্ধার করতে, না পারলেন প্রতিষ্ঠা করতে। তবু নিয়ম করে বসেন অনেকক্ষণ। মন স্থির হয় না। চিন্তাগুলোর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। আসন ছেড়ে ওঠেন। মনে যেন নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন। মনে হয়, গুরুদেবের অধ্যায়টা তার জীবনে না এলেই ভাল হত।

আশ্রম থেকে অনেক চিঠি পত্র এসেছে। লোক এসেছে। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন—তিনি একক সাধনায় বিশ্বাস করেন। গুরুদেবের নির্দেশও তাই ছিল। কিন্তু সাধনার প্রতিষ্ঠানগত যৌথ ধর্মের আচার পালনে তার স্পৃহা নেই। এ নিয়ে তিনি আর পত্র বিনিময় হোক—তা তিনি চান না। পত্র এলেও তিনি উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন না।

এ সময় থেকেই সকালে ও বিকালে রিটায়ার্ড লোকদের সঙ্গে হাঁটেন ও এক জায়গায় বসে বসে নানা আলোচনা করতেন। পাড়ার অনেকের সঙ্গেই মৌখিক পরিচয় ছিল। এবার অনেক বেশি জানাশুনা হল। বেশ একটা বড় দল হল। পার্কে হাঁটতেন। তারপর গোল হয়ে বসে নানা আলোচনা হত। অফিসের স্মৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, ব্লাডপ্রেসার, আর্থারাইটিস, বৃটিশ আমলের শাসন ব্যবস্থা, মন্ত্রীদের জ্ঞানসম্পর্কে নানা কৌতুককর কাহিনী, বারোয়ারী পূজোর মাইকের উপদ্রব, ছেলেমেয়েদের মধ্যে মার্ক্সিজমের প্রভাব, মহাকাশে কুকুর পাঠান, যৌবন ফিরে পাবার জন্যে বিদেশে গ্লাণ্ডের ওষুধ আবিষ্কারের চেষ্টা— কিছুই বাদ যেত না।

ইতিমধ্যে সুকুমার অনার্স নিয়ে বি.এ. ফার্স্ট ক্লাস আগেই পেয়েছিল ইংরেজীতে। এম.এতেও ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে দক্ষিণ কলকাতার একটা নামী কলেজে লেকচাবার হল। অধ্যাপনায়ও মাইনে বড্ড কম। তিনি ডেকে সুকুমারকে বললেন, মাইনে কম বলে

দুঃখ কর না। তোমার বাড়ি আছে, গাড়ী আছে, আমার সবকিছুই তোমার। তাছাড়া এ মহৎ পেশা। কম আয় হলেও তা নিয়মিত পাবে। রিসার্চ করতে চাও — করো। তবে পয়সার জন্যে টিউশনি করো না।

তারপর তিনি সুকুমারের জন্যে মেয়ে দেখতে লাগলেন। একটি মেয়ে নাকি সুকুমারের খুব পছন্দ — চাকরদেব কাছে শুনলেন। বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটি গ্র্যাজুয়েট। সুন্দরী, চটপটে, পরে বুঝেছিলেন, বিয়ের আগেই ওদের জানাশুনা ছিল — ভালবাসাও ছিল। থাক — চিরকাল যেন ভালবাসা তাকে। ছেলে বাবা-মা কারো ভালোবাসাই তো পুরোপুরি পায়নি। আজকাল স্বামী স্ত্রী যেন ভাইবোনের মত। স্ত্রী উচ্চস্বরে স্বামীকে ধমকায়। স্বামী স্ত্রীব নাম ধরে প্রকাশ্যে ডাকতে থাকে। সুকুমার ঠিকসময় না ফিরলে শর্মিলাও উৎকণ্ঠিত হয়। ফিরে সুকুমার ধমক খায়। বেশ আছে ওরা। সুকুমার মাইনের কিছু টাকা সংসার খরচের জন্যে বিনয়বাবুর হাতে দিতেন। বিয়ের পরের মাসে বিনয়বাবু শর্মিলাকে ডেকে সংসার খরচের টাকা হাতে দিয়ে বললেন, এইবার থেকে সংসার তুমি চালাবে — যতদিন বেঁচে আছি — এই টাকা দিযে যাব — দরকার পড়লে চেয়ে নিও। প্রতিমার গহনা শর্মিলাকে দিযে দিলেন। সংসারের ভার নিতে শর্মিলা একটু আপত্তি করে তারপর সত্যিই ভার নিল। শর্মিলা প্রথমেই একটা রাধুনি ও একট চাকর ও ড্রাইভার রেখে বাকী সকলকে তিনমাসের মাইনে বখশিস দিয়ে বিদায় দিল। এক তলার চারটি ঘরে — দুঘর ভাড়াটে বসিয়ে দিল। দু'ঘর ভাড়াটেই অধ্যাপক। শিক্ষিত ও নিরীহ। কোন গোলমাল হয না। বিষ্টু আগেই মরেছিল। তাই বিনয়বাবুর খাস চাকর আর রইল না। বহুকাল পর আবার বিনযবাবুব বাড়িতে সংসার বসল।

বৃদ্ধদের সমাবেশে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হত নিজেদের প্রথম যৌবনের স্মৃতিকথা। সকলের চোখে মুখেই যেন ফুটে উঠত আবার যৌবন ফেরত পাবার কী তীব্র গোপন ব্যাকুলতা। এতকাল বেঁচে বেঁচে জীবন ক্ষয় করে করেও জীবন উপভোগের কী অতৃপ্ত ও অশান্ত আকর্ষণ। মনে হয়, জীবনের কী সম্মোহনে এ মানুষগুলো, এমন কি শ্মশানের দিকে মুখ করে একপা এগিয়ে বেঁচে থাকার কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। বিনয়বাবুর মনে হয়, চরিত্রহীন সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি কামুক স্বামীর হীন আসক্তির সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে এই জীবনলোলুপতার। মৃত্যু কি ? চেতনা চলে যাবে — এই তো মৃত্যু। চেতনা চলে গেলেও বেঁচে থাকা যায় — সেই বাঁচা কেউ চায় না। কোমা কাম্য নয়। শুধু চেতনা চিরতরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাবে। অথচ এই চেতনাকে ধূর্ত করতে, চালাকি করতে, কৌশল করতেই ব্যবহার করছে। একে মননদীপ্ত, মননশীল, উচ্চচিন্তার-শৃঙ্খল-পরম্পরায় যে আনন্দ পাওয়া যায় তা তো অধিকাংশের কাছে অজ্ঞাত। একটা ঘরোয়া-চেতনা, আট পৌরে চেতনা, একটা কেজো চেতনা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিল। দেহ জীর্ণ হল, চেতনা অসংলগ্ন হল, চেতনা থেকে স্মৃতি খসে খসে যেতে লাগল — তবু যতটুকু চেতনা থাকে তাকে নিয়েই চিরকাল বাঁচবার সাধ মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধদের। বিশুদ্ধ মননের জগতে, বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে অধিকাংশ মানুষ মরবার সময়

পর্যন্ত জন্ম নিতে পারল না। গত জন্ম, আগামী জন্ম এগুলো কতগুলো সংস্কার — জন্মের অনেক পরে পরের মুখে শেখা। এগুলো সহজাত নয়। দেহের বিশ্বাস, রক্তের বিশ্বাস : জীবন একটাই মৃত্যু একটাই। মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নেই বলেই মৃত্যুকে এত ভয়। মানুষের বয়েস বেশী হয় দেহটার। তাই বেশী বয়সে দেহই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অল্প বয়সে মন দেহকে ব্যবহার করে — বেশী বয়সে দেহ মনকে ব্যবহার করে। বেশী বয়সে মানুষ অনেকটা দেহ-সর্বস্ব হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু অনুভূতিগুলো তা বলে ভোঁতা হয়ে যায় না। বরং তীক্ষ্ণ হয়। সংসারের অবহেলা মর্মে মর্মে অনুভব করে। সংসার যে প্রচ্ছন্নভাবে বিমুখ হয়ে গেছে, তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে — একথা ষোল আনা বুঝতে পেরেও আঠার আনা ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু ভুলতে পারে কি ?

কিন্তু বিনয়বাবু তো মৃত্যুর জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত। তিনি জীবনের চোখে ধূলি দিয়ে আর দুদিন পরে আটাত্তরে পদার্পণ করবেন। শুধু সকালে বিকালে বের হওয়া ছাড়া কোন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারও সঙ্গে যোগ রাখেন না। তিনি মৃত্যুর ক্যামোফ্লেজে জীবন যাপন করছেন। বেঁচে থেকেও মৃত্যুর মধ্যে অজ্ঞাতবাস করছেন। কিন্তু জন্মদিনে তিনি ধরা পড়ে যান। পুরানো কেউ নেই — এ বোধও হয় না। কারণ পুরানো জগতের মত পুরানো মানুষ নেই — এ এত আস্তে আস্তে পাল্টে যায় — পুরানো পৃথিবী কবে পাল্টে গেছে — মানুষ তা অনেক পরে বুঝতে পারে। চারদিকে নতুন কচিমুখ। বিনয়বাবুকে দেখে তাদের বিস্ময় — এই বয়সে এত সুন্দর। ওদের বিস্ময়ের মধ্যে একটা তিরস্কার রয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ হারিয়ে এত খানি ভাল চেহারা রেখেছে কেন এই স্বার্থপর মানুষটি ? যৌবনে মৃত স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূর যৌবন যেন কিছুটা কিছুটা করে চুরি করে আজ তিনি নিজের সুঠাম দেহ, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, টকটকে রঙ বজায় রেখেছেন। জন্মদিন যেন আত্মীয়দের কাছে একটা ভৎর্সনার দিন। তাছাড়া সেদিন সকলের মনে পড়ে যায়, তিনি এখনও বেঁচে আছেন। মৃত্যুর ক্যামোফ্লেজ ধরা পড়ে যায়। মৃত্যুর মধ্যে অজ্ঞাতবাস একদিনের জন্যে ফাঁস হয়ে যায়। তাঁর বেঁচে থাকাকে কোন মতেই আর গোপন করা যায় না। একদিনের জন্য তিনি ধরা পড়েন। মনে হয়, মৃত্যু থেকে প্যারোলে একদিনের জন্যে বছরে ছাড়া পান। জন্মদিনের নেমতন্ন পাবার আগে কারো মনে তিনি থাকেন না — নেমতন্নের পরের দিন যারা এসেছিল — তারা ভুলে যায়। বছরে তিনি একদিন বাঁচেন। বেঁচে থাকার লজ্জা নিয়ে বসে থাকেন স্মিত মুখে। প্রতিবারই ভাবেন, এইবার যেন শেষ হয়। সামনের বছর যেন তিনি একটি ফটো শুধু থাকেন। হয়ত একটা মালা। ফুলের মালাসহ ফটো হবার সাধ নিয়ে প্রতি বছর জন্মদিনের শেষে নিজের ঘরে ঢোকেন। তখনও হলঘরে জীবন্ত কণ্ঠের কলকাকলী।

..... না, বেলা অনেক হল। শর্মিলা হয়ত এখনই আসবে। জন্মদিনের নেমতন্নের তালিকা, কেকের অর্ডারের পরামর্শ — একটা যন্ত্রণার উপস্থিতি — আরও একটি বৃহত্তর অপমান, উৎকণ্ঠা ও তিরস্কারের প্রস্তুতি হিসেবে।

স্নান শেষ করলেন। খেতে খেতে দেখলেন শর্মিলা এল — এমনকি সুকুমারও দরজার

কাছে। একটু আশ্চর্য হলেন, কই খাবার সময় সুকুমার তো কখন আসে না। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকাল। পরস্পরের চাওনিতে তিনি বুঝলেন, এবার জন্মদিনের প্রসঙ্গ — তবে হয়ত জন্মদিনে হয়ত নতুন কিছু করতে চায়। হঠাৎ বিনয়বাবু বুকের মধ্যে কেমন একটা কাঁপন অনুভব করেন। নতুন কিছু মানে নতুনতর লজ্জা — তার পর কোন নির্লজ্জ অনুরোধ। খাবার ইচ্ছে চলে যায়। কেমন একটা ক্ষোভ ও রাগের মাঝামাঝি — একটা অসহায় — আত্মরক্ষাহীন অভিমান দেখা দেয়। মনে হয় তাঁর কেউ নেই — কেউ তাঁর হয়ে কথা বলবার নেই, তাঁর অসহায় অভিমানকে কেউ মর্যাদা দেবার নেই। তিনি তো কারো ক্ষতি করেননি। তাঁর দোষ — তিনি শুধু বেঁচে আছেন। শুধু বেঁচে থাকবার জন্য কত ধিক্কার আর তাঁর প্রাপ্য। আজ কেমন করে মনে পড়ল, পৃথিবীতে তাঁর সত্যি কেউ নেই। একজন অন্তত থাকা উচিত — যে তাঁকে বুঝতে পারে। খাবার ইচ্ছে চলে যায়। এখনও অনেক পদ বাকী। সবটা না খেয়ে উঠে যাবার মত নাটক তিনি করতে পারবেন না। খেতে হবেই। সারাজীবন নিজের ওপর অত্যাচার করেছেন — আজও করতে হবে। অথচ বয়েস হয়েছে — আগের শক্তি নেই। আগের মত সহ্যশক্তি নেই, তবু সহ্যশক্তির ভান করতে হবে। নিজের ওপর জোর করবার ক্ষমতা কত কমে গেছে। বসে বসে খাওয়া — শাস্তির মত বাধ্যতামূলক। বার বার ওদের পরস্পরের দিকে তাকান বিনয়বাবু না তাকিয়েও বুঝতে পারেন। ওরা যে পরস্পরকে চোখ দিয়ে তাগাদা করছে তা বুঝতে বিনয়বাবুর অসুবিধে হচ্ছিল না। সুকুমার একটু দ্বিধা করে বলে — দাদু, আমার পরীক্ষার খাতা তো দেখা হয়ে গেছে — কলেজ খুলতে এখনও অনেক বাকী। ভাবছি, মুসৌরী যাব ওকে নিয়ে।

শর্মিলা বলে, আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। বেশ হবে। বিনয়বাবু জিজ্ঞেস করেন — কবে যেতে চাস ?

সুকুমার বলে — পরশু সকালে।

বিনয়বাবু বিস্ময় ও উল্লাসে স্তব্ধ হয়ে যান। শর্মিলাকে বলেন, আমি মুসৌরীতে অনেকদিন ছিলাম। তা সুকুমার রিজারভেসন করেছিস তো ?

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে, রিজারভেসন হয়ে গেছে। পরশু সকাল ছটায় ট্রেন।

শর্মিলা কটমট করে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে তারপর বলে, ওমা, রিজারভেসন করেছ নাকি.... কই আমাকে তো বলনি। দাদুকে না জিজ্ঞেস করে....।

সুকুমার একটু অবাক হয়ে শর্মিলার দিকে তাকায়। কি যেন বুঝতে চায়। তারপর বলেন, ... না একলা একলাই ....। আবার শর্মিলার দিকে তাকায়।

— আমি তো তোমাকে তিনটে টিকিটের কথাই বলেছিলাম..... তা তুমি অবশ্য বলেছিলে, দাদু বহুদিন মুসৌরী ছিলেন — যেতে হয়ত চাইবেন না। কখন একলা গিয়ে টিকিট করে নিয়ে ....।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাড়িতে তো থাকতেই হবে। আমার আর এই বয়সে

দৌড় ঝাপ করতে ইচ্ছে করে না। বেশ তো ঘুরে আয় গিয়ে। দেরাদুন -মুসৌরী তো বটেই — ঐ হরিদ্বার বেল্টেও আমার অনেক কনষ্ট্রাকসন আছে। কোথায় গিয়ে উঠবি ? আমার জানাশুনা তো কম ছিল না..... এখন তাঁরা সব কোথায় কে জানে।

সুকুমার বলে — সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে 'খন।

বিনয়বাবু বলেন — দেরাদুন থাকবি তো দু'চারদিন — না সেদিনই দেরাদুন থেকে মুসৌরী ?

শর্মিলা বলে — দাদুর কাছ থেকে সব জেনেশুনে নাও — যা ন্যালা-ম্যাপা লোক — পথ চলতে ভয় হয়। দাদ্ সঙ্গে থাকলে তবু কত বল-ভরসা ছিল। গরম জামা কাপড় তো লাগবে — দাদুর যদি কিছু থাকে।

— আমার ঐ বাক্সে গরম জামা কাপড় একগাদা আছে। দেখ কিছু ব্যবহারযোগ্য আছে কিনা।

শর্মিলা জানায় — আমি তো প্রতি শীতেই রোদে দিয়ে রাখি। যা আছে যথেষ্ট।

একটা অদ্ভুত আনন্দে বিনয়বাবু যেন কথা বলতে পারছিলেন না। এমন খুশী হওয়া বহুকাল তাঁর জীবনে ঘটেনি। এমন স্বতঃস্ফূর্ত খুশী হবার শক্তি যে এই বয়সেও রয়েছে আজ তা তিনি সানন্দে আবিষ্কার করলেন। খুশীর আবেগে চিন্তা করতেও রাজি নন। কিসের জন্যে, কেন এত খুশী হয়েছেন — খুশীর আবেগে তাও ভাবতে রাজি হলেন না।

— এককালে এই মুসৌরী বা সিমলাতে — এমন কি দেরাদুনেও, রাস্তায় ঘাটে ভারতীয়দের বড় দেখা যেত না। শুধু ইউরোপীয়ান। দেখে দেখে মনে হত ইংল্যাণ্ড বা কন্টিনেন্টের কোন হিল টাউনে এসেছি, তখন ভদ্রলোক বলতে সাহেবদেরই বলত। মুসৌরী থেকে নামবার সময় দুটো ব্রীজ দেখবি — ওদুটো আমারই কনস্ট্রাকসন। দি দেন গভর্ণর নিজে হাজির ব্রীজ ওপেন করবার সময়। ফটোও তোলা হয়। হরিদ্বার-হৃষিকেশ — লছমন ঝোলা দেখে আসিস্, কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যাস। সঙ্কোচের কোন দরকার নেই। খাওয়া শেষ করে তিনি নিজের ঘরে চলে আসেন। ওরাও চলে গেল।

ঘরে এসে বোধ করলেন তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েছিলেন। যদিও আরো কিছুটা সময় ওদের তিনি দিতে পারতেন — আরও কিছুটা মুসৌরীর গল্প। কিন্তু খুশীটা বড় বেশি প্রকাশ্য হয়ে পড়ছিল। তিনি ওদের সামনে বেশিক্ষণ থাকতে সাহস পাচ্ছিলেন না। এমন একটা উগ্র খুশীকে বাইরে প্রকাশ করে ওর সজীবতাকে বাজারে করে তোলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর ধীর, স্থির, শান্ত ও সৌম্য চেহারার বাইরে তাঁর চাঞ্চল্যকে ওদের সামনে তিনি বেশিক্ষণ স্বীকার করতে রাজি নন। তাঁর চাঞ্চল্য ও চোখে মুখে খুশীর আভাস ওদের খুব অবাক করে দেবে। ওদের অবাক মুখ দুটো তার খুশীকে মুহূর্তমধ্যে আত্মগোপন করবার তাড়া দেবে। আর আত্মগোপনকারী খুশী গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশে

বেশিক্ষণ থাকলে নিজের অস্তিত্বই হয়ত রক্ষা করতে পারবে না। খুশীকে এই মুহূর্তে তিনি বিপন্ন করতে চান না। তাই আরও ওদের সামনে দাঁড়ালেন না। তাছাড়া খুশীর সবটুকু তিনি ওদের সঙ্গে খরচ করতেও চান না। একঘেয়ে বিষন্নতার মধ্যে একা একা সময় কাটান — বিষন্নতার স্বাদ বদল শুধু জন্মদিনের উৎকণ্ঠা, আসন্ন জন্মদিনে বেঁচে থাকবার অপমানের আত্মগ্লানিতে আর মৃত্যু তাকে একঘরে করে দিয়েছে এই নির্লজ্জ সংবাদের মধ্যে বেআব্রু হয়ে বসে থাকা। একঘেয়ে বিষন্নতার মধ্যে এইটুকু তার মুখ বদল। তাই একা একা বাকি খুশী টুকু লোভী বালকের মত উপভোগ করবার জন্যে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে আসেন। নিজের ঘরের মৃতদের শোকের আবহাওয়ার মধ্যে জীবন থেকে নেয়া এক ঝলক লজ্জিত খুশীকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন।

শুধু যে জন্মদিনের নবকের উপদ্রবের হাত থেকেই বাঁচবেন তা নয় — শর্মিলার যখন তখন ঘরে আসা, নানা জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে বিনয়বাবুর গার্হস্থ জীবন সম্পর্কে কুকুর-কৌতূহল এসব থেকে ক'দিনের জন্যে অব্যাহতি। তাছাড়া শর্মিলা ঘরে এলেই ওর সজীব প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল আচরণে ঘরটি যেন শর্মিলার হয়ে উঠতে চাইত — শর্মিলা যেন নিজের অজান্তেই ঘরদোর সব দখল করে নিচ্ছিল। আবার তিনি যেন তার ঘর ফেরত পাবেন। ঘর কদিনের জন্যে বিশ্বাসঘাতক হবার সুযোগ পাবে না। বাড়িটাকে আবার ক'দিনের জন্যে নিজের বলে বোধ করতে পারবেন। জীবনটা পর হয়ে গেছে — কদিনের জন্যে যেন জীবন অল্প সময়ের জন্যে হলেও আপন হবে। জীবনটা কবে যে পর হয়ে গেছে তা তিনি মনেও করতে পারলেন না, এমন শার্প মেমরী থাকা সত্ত্বেও। নিজের ঘর থেকে বের হলেই কুণ্ঠিত হতে হবে না — অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচের পীড়ন সহ্য করতে হবে না। সব থেকে বড় কথা, বেঁচে থাকবার গ্লানি ও লজ্জা থেকে ক'দিনের জন্য পরিত্রাণ — জন্মদিনের পাইকারী যন্ত্রণা, লজ্জা, আত্মগ্লানি, উৎকণ্ঠা ও গোপন-তীব্র অপমানের হাত থেকে মুক্তি। বহুকাল পরে ক'দিনের জন্যে তিনি একটু বেঁচে থাকবেন। জীবনটা আপন হবে। বহুকাল পরে তিনি বেঁচে থাকবার স্বাদ পাবেন। বেঁচে থাকবার স্বাদ, জীবনের আস্বাদন তিনি পাবেন। বিনয়বাবু ঠিক করলেন, যতদিন ওরা এখানে থাকবে না ততদিন তিনি সংবাদপত্রের 'শোকসংবাদ' পড়বেন না। হঠাৎ মুসৌরীর চেহারা তাঁর মনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই মুসৌরীতে তিনি বড় বিষণ্ন দিনযাপন করতেন। তাই মুসৌরীর চিত্র মনে মনে তাঁর খুশীকে বার বার আটকে দিচ্ছিল। তিনি মুসৌরীর চিত্র ত্যাগ করলেন। ওরা মুসৌরী দেখুক — তিনি মুসৌরীর চিত্র দেখবেন না। হাসি পেল, শর্মিলার ছেলে-মানুষী কৌশল দেখে। দুটো টিকিট কেটে এনে বিনয়বাবুকে ছেলে ভোলবার জন্যে যেতে বলা। মনে মনে একটু হাসলেন — সুকুমারের বিষণ্ন মুখ মনে করে। ঠিক যে হাসি পেল তা নয়। খুশীর বেগকে প্রকাশ করবার জন্যে একটা হাসির দরকার ছিল — তাই শর্মিলার ছেলেমানুষী কৌশল ও সুকুমারের বিপন্ন মুখ ও অনভ্যস্ত মিথ্য বলবার চেষ্টাকে স্মরণ করে তিনি হাসলেন।

হঠাৎ তার মনে হল — ঐ দিকের ঘরগুলোকে কতকাল তিনি দেখেননি। সুকুমার-শর্মিলার ঘরগুলোর ভেতরেও যান না কতকাল। সুকুমারের অসুখ বিসুখ হলে দু'এক মুহূর্তের জন্যে ভেতরে গেলেও — ঘরগুলো দেখা হয়নি তখন। ঘরগুলো দেখবার একটা সানন্দ বিগ্রহ বোধ করতে থাকেন। আবার ঠাকুর চাকর তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকবে। তিনি যেন আবার কর্তৃত্ব ফিরে পাবেন। তিনি এ ঘরের বাইরেও বেঁচে থাকবার স্বাদ, জীবনের একটা স্বীকৃতি পাবেন। বহুকাল পর জীবন যেন তাকে স্বীকার করতে চলেছে। একলা থাকবার, কর্তৃত্ব করবার এতখানি আকাঙ্ক্ষা তাঁর ভেতরে ছিল তা তিনি জানতেনই না। আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যে এতখানি জীবন লুকিয়ে ছিল — তিনি কোনদিন টেরও পাননি। অথচ সবই তো স্বেচ্ছায় ওদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ভেতরে, আশপাশে এতখানি জীবন ওৎ পেতে বসেছিল --- তা ভাবতেই পারেননি। প্রসন্ন উত্তেজনায় আজ আর তিনি কিছু ভাবতে চাইলেন না। ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন। আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকেন। এতখানি উত্তেজনা অনেক দিন বোধ করেননি.... অনেক কালই হবে বোধহয়। এই বয়সে উত্তেজিত হতে খারাপ লাগছে না। আস্তে আস্তে একটা অস্বস্তি যেন মাথা উঁচু করতে চাচ্ছে। যেন ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারছেন ---- এ বয়সে এতখানি বিচলিত.... ঠিক নয়। বরং মনের এ ভারটি চলে গেলেই স্বস্তি পান। তবু, এতখানি উল্লাসে বিচলিত হবার ক্ষণটিকে বিদায় দিতে মন চায় না। ফটোগুলোর দিকে তাকান: আজ অন্তরের কোন মিল এই মুহূর্তে খুঁজে পান না — ফটোগুলোকে কেমন নিষ্প্রাণ — দূরের বলে মনে হতে থাকে। যেন তিনি জীবনের লক্ষ্মণ বোধ করে ফটোগুলোর অন্তরঙ্গতাকে অস্বীকার করছেন। এই মুহূর্তে ফটোগুলো পর হয়ে গেছে— যেমন পর হয়ে যায় নিকট-জনের মৃতদেহগুলো। কত আপন অথচ কত পর। ফটোগুলোকে কেমন পর-দূরের মনে হতে থাকে। অথচ তিনি দুঃখ বোধ করতে পারছেন না। স্যাঁতস্যাতে বিষণ্নতার শরিক ফটোগুলো আজ দূরের বলেই নিজে এতখানি সজীব বোধ করতে পারছেন। ফটোগুলোকে কেবল দূরের নয় — কেমন ম্লান ও বিষণ্ন মনে হতে থাকে। অসমাপ্ত জীবন থেকে বিদায় নিয়ে আজ যেন বিনয়বাবুর মধ্যে পরিণত বয়সে জীবনের এই লক্ষ্মণ দেখে ওরা নিরুপায় মৃত্যুর মধ্যে কেমন কাতর হয়ে উঠেছে। আজ ওরা যেন বিনয়বাবুকে চিনতে পারছে না। ফটোগুলোর সামনে এতখানি উল্লসিত হওয়া ঠিক নয়। জীবন থেকে বঞ্চিতদের সামনে এমন খুশীর আবেগ শুধু ওদের চির নিরানন্দময় অন্ধকারকে আরো অন্ধকারে নির্বান্ধব করে দেয়া। ওরা শুধু বিষণ্নতাই আশা করে — বিষণ্নতাই ওদের পাওনা। আজ তিনি ওদের বঞ্চিত করেছেন। নিজেকে ফটোগুলোর সামনে বেমানান লাগছে। তিনিই এই ফটোগুলোর একমাত্র সঙ্গী। আজ তিনি এই ফটোগুলোকে ত্যাগ করতে চলেছেন। ফটোগুলো যেন তাকে হারাবার ব্যথা মুখ বুজে সহ্য করছে।

একটা সোফায় বসে পড়েন। ক্লান্ত মনে হয়। উল্লাসের ভারে আর সঙ্কোচের পীড়নে কেমন অবসাদ আসে। অবসন্ন হয়ে তিনি ফটোগুলোকে অভিযুক্ত করেন। তাকে কোন

রকম আনন্দ বা উল্লাস বোধ করতে দেবে না — এ যেন ফটোগুলোর নীরব অত্যাচার। তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাসের বাতাসে ফটোগুলো যেন প্রাণ পায়।

খাবার পরে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। আজ ঘুমের কথা মনে এল না। ঘরটি যথাসম্ভব অন্ধকার করে তিনি ইজি চেয়ারে চোখ বোজেন। অবসাদ বোধ করতে শুধু করেছেন। অবসাদে শিরা উপশিরাগুলো ক্লান্ত। ঘর অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় ফটোগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া চোখ বুজেও সব অস্বীকার করেন। ফটোগুলোর কাছে মুখ দেখাবার লজ্জা থেকে তিনি এখন রেহাই চান। ইতিমধ্যেই সব কিছু যেন বিস্বাদ মনে হতে শুরু করেছে। এখন যেন নিজের উল্লাস ও উত্তেজনাকে ক্ষণিক অপ্রকৃতিস্থতা বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, জন্মদিন না হবার উৎসাহে নিজে নিজে বড্ড বাড়াবাড়ি করেছেন।

বেশিদিন বাঁচবার এই ত্রুটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, বছরের একটা দিন — হাজার কষ্ট হলেও — অনেকগুলো পরিচিত মানুষের মুখ দেখতে পান। নিঃসঙ্গ বন্দী জীবনে যেন অনেকে আসেন। ওদের শ্রদ্ধা, প্রণাম, বিস্ময়, স্তোকবাক্য এগুলোর মধ্যে আজও যেন কেমন একটা প্রাধান্য — কতগুলো নবীন তরুণ প্রাণের কলরবের মধ্যে নিজের প্রাণের মধ্যে ওদের প্রাণের স্পর্শ গান — নিজের বাকী জীবনের মধ্যে একটা বেঁচে থাকবার তাজা স্বাদ অনুভব করেন। নিজের এই ভাবনাগুলো যেন অনায়াসে তাঁর অন্তর থেকে উঠে আসছে। কিছুতেই রোধ করতে পারছেন না। এই অনুভূতিগুলোর সঙ্গে তাঁর ঠিক পরিচয় নেই। তবু কেমন অজানা লাগছেনা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নিজের এই অনুভূতিগুলোর স্বাদ নতুন নিজে যেন কি রকম অনুভূতির খপ্পরে পড়ে গেছেন। কিন্তু সব মিলে নিজেকে ঠিক অপরিচিত লাগছে না। কোথায় যেন এসব আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার সঙ্গে তাঁর মুখ চেনা ঘটেছে। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের জন্যে বছরে একদিন যে তাঁর মন উন্মুখ হয়ে ওঠে — একথা এতকাল তিনি জানতেন না। আজ এদের আসবার সম্ভাবনা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তা টের পেলেন। জন্মদিনে এদের প্রত্যাশার জন্য তাঁর মন উন্মুখ — একথার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না — অপরিচিত ব্যক্তি যখন আত্মীয়ের পরিচয়ে আপন হয়ে দাঁড়ায় — তেমনি জন্মদিনের আত্মীয়-স্বজনদের প্রত্যাশা তাঁর আত্মিক আকাঙ্ক্ষা — তবে আজই পরিচয় হল।

সুকুমার শর্মিলা ভুলে গেল। নেমতন্নের ডাক না পেলে আত্মীয় স্বজনদেরও মনে পড়বে না। আজ সত্যি সত্যিই সবাই তাকে ভুলে গেছে। বেঁচে থেকেও তিনি বিস্মৃতির জগতের বাসিন্দা। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তিনি ছিলেন একথাও কারও মনে পড়বে না — আজও তিনি আছেন একথাও কারও মনে পড়বে না। নিজেকে ভীষণ একা মনে হয়। মনে হয়, জীবিত অবস্থায় তাকে শ্মশানে নিয়ে আসা হয়েছে। লজ্জায় তিনি মরার মত পড়ে আছেন — শবের অভিনয় করে চলেছেন। বেঁচে থেকে তিনি আজ শব। তাঁর বেঁচে থাকার স্বীকৃতি আজ কেড়ে নেওয়া হল। তিনি শবের মত অসহায় অথচ শবের মত মৃত নন। তিনি নীরব — কিন্তু বাক্য হারা নন। আজ তার যোগাযোগ

করবার সুযোগটুকু থেকে তাকে বঞ্চিত করা হল। তাই শ্মশানে এলেও কেউ তার সঙ্গে কথা বলবে না। মৃতের সঙ্গে কথা বলা বারণ। তিনি তো পারেন কথা বলতে, আশীর্বাদ করতে, স্মিত মুখে ওদের অত্যাচার সহ্য করতে। চোখ বুজে অন্ধকারকে আরও গভীর করে বিনয়বাবু আকণ্ঠ নিঃসঙ্গতার বেদনায় স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

ওরা মুসৌরী চলে গেলে তিনি একা থাকবেন। একটা চাকর আর একটা ঠাকুরে ভরসায় রেখে ওরা চলে যাচ্ছে। তাঁর যদি হঠাৎ একটা কিছু হয় তা হলে মুখাগ্নি করতেও ....। হঠাৎ তাঁর মনে হয়, সুকুমার শর্মিলার তাঁর ওপর কোন আকর্ষণ নেই। হাজার হোক, তিন পুরুষ তো.. তিনি যতখানি আপন ভাবেন... ওরা তা ভাবে না, নইলে অমন করে কি জন্মদিন ভুলে যেতে পারত ? পারে আপনজন কেউ ? নিজেকে নির্বান্ধব, অসহায় ও বৃদ্ধ মনে হতে থাকে। মনে একটা সান্ত্বনাহীন অভিমান পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। কেবল মনে হয় সারাজীবন তিনি স্নেহ ভালবাসা পাননি। বাবা, মা বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন অতি অল্প বয়সে — ক্লাসের সেরা বলে বাবার কাছে আদর। মা তো ছোট ভাইদের নিয়ে ব্যস্ত। স্ত্রীর সঙ্গে তো পরিচয়ই হয়নি ভালো করে — সেই ছাত্র জীবনে ও কর্ম জীবনে ক'দিন তিনি বাড়ি থেকেছেন। তাঁর ছেলের বাবা সম্পর্কে কোন মাথাব্যথাই ছিল না। তিনি শুধু সবার জন্যে উদ্বিগ্ন ও শোক পেয়েছেন। দায়িত্ব ও উৎকণ্ঠায় সারা জীবন ছটফট করেছেন। প্রতিমা পরের মেয়ে — তার কথা তো তিনি ভাবতেই চান না, শর্মিলা সুকুমারের ব্যাপার তো আজ স্পষ্ট হয়েই গেল। সারাজীবন তিনি ভালবাসা, স্নেহ, মমতা থেকে বঞ্চিত। আজ মৃতরা ফটো হয়ে তাকে চির বিষণ্নতার অন্ধকারে নেমতন্ন করে চলেছে। কেমন আচ্ছন্নের মত লাগে। তন্দ্রা আসে।... হঠাৎ দেখলেন, তিনি মরছেন। প্রতিমা ব্যাকুল হয়ে ছুটে তাঁর বুকের ওপর মুখ রেখে কাঁদছে। তিনি আজ মরবার সময় প্রতিমাকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করতে চাইলেন না। তবু এক ফোঁটা চোখের জলও কেউ ফেলছে। এই অন্তিম মুহূর্তে প্রতিমাকে আপন মনে হয়। তিনি ঠিক এই ভাবেই প্রতিমাকে কাঁদতে দেখেছিলেন ওর মৃত ছেলের বুকের ওপর মুখ ঢেকে। তিনি যে প্রতিমার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবেন — তা সম্ভব নয়। হাত অবশ হয়ে গেছে। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না — তিনি কি মরছেন, না, মরে গেছেন। সম্ভবতঃ মরছেন। গলা শুকিয়ে গেছে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। জল তো না চাইতেই দেয়া উচিত। সুকুমারের তো কর্তব্য — কোথায় সুকুমার, মুসৌরী ? হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। দেখলেন ঘেমে গেছেন। এখনও যেন প্রতিমার কান্নায় ভেজা নরম মুখ বুকের পর অনুভব করছেন। হাত পা নাড়াচাড়া করে স্বস্তি পেলেন। এবার তিনি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখ বুজে থাকতেই ইচ্ছে করছে না। ঘুমুতে কেমন ভয় ভয় হচ্ছে।

হঠাৎ ভেজানো দরজার কাছে সুকুমার ও শর্মিলার ফিসফিস কথা শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খুব আস্তে সুকুমারের ডাক শুনতে পান। ঘুমালে না জাগেন — জেগে থাকলে শুনতে পান, এমনি কণ্ঠস্বরে সুকুমার ডাকে — দাদু, দাদু।

মুহূর্তে বুক কেঁপে ওঠে বিনয়বাবুর। সর্বনাশ, জন্মদিনের কথা তো আবার ওদের মনে পড়ে যায়নি! একটা প্রবল ভয় ও আশঙ্কায় ভেতরটা শুকিয়ে ওঠে — এই একটু আগে জল খাওয়া সত্ত্বেও। তবু শান্তকণ্ঠে বলেন — ভেতরে আয় — দরজা খোলাই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার ও শর্মিলা অপরাধীর মত ঘরে ঢোকে। সুকুমার বলে চলে — দাদু, পরশু তো তোমার জন্মদিন — আমাদের যাওয়া হবে না। এমন ভুল আমাদের কখনও হয় না। ভাগ্যিস আমরা শুধু ভাবছিলাম — গত বছর আমরা ঐ সময় কি করেছি, এমনি সময়....।

শর্মিলা তাড়াতাড়ি বলে — আমারই তো আগে মনে এল। ইস্ কি ভুল — কী মরণদশা আমাদের। আমার কিন্তু গোড়া থেকে কেবল মনে হচ্ছিল — কি যেন বাদ পড়ে যাচ্ছে। দাদু আপনি কিন্তু কিছু মনে করতে পারবেন না। জন্মদিনটা এবার বেশ বড় করে করব.... বরাবরই ভাবছি অথচ .... শোন এখনই কিন্তু কেকের অর্ডার দিতে হবে — টিকিট ফেরত দিয়ে আসবার পথে অর্ডার দিয়ে আসবে। আমি যাই।

— শোন সুকুমার, তোরা চলে যা। টিকিট ফেরত দিতে হবে না। একবার জন্মদিন বাদ গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আমি নিজেই যা পারি করব। অনেক জন্মদিন তো হয়েছে। একটাতে একটু কম হৈ চৈ হলে .... এই বয়সে এখন হৈচৈ ভালোও লাগে না।

— ওমা তাও কি হয়। দাদুর যেমন কথা। আপনার নাতি এখনই গিয়ে টিকিট বদলে আনবে। আমরা পরশুর পরের পরের দিন যাব। তা বলে জন্মদিন মুখে করে চলে যাব। তাও কি হয় নাকি? এমন পোড়ার মন ... তুমি এই মেমরী নিয়ে কলেজে পড়াও কি করে? তাছাড়া এবার জন্মদিনটা বড় করেই...... নেমতন্নের লিষ্ট তো করাই আছে।

বিনয়বাবু বুঝলেন তিনি যত আপত্তিই করবেন — ততই এরা ধরে নেবে, তিনি ক্ষুণ্ন হয়েছেন, রাগ করেছেন, অভিমান হয়েছে, অবহেলিত বোধ করছেন। ততই এরা আরো সাধ্য সাধনা করতে থাকবে। রাগ কমাবার জন্যে ওদের উদ্যোগ আরো ভয়াবহ ও ক্লান্তিকর হবে। আর এরা যে ভুলে গিয়েছিল তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে জন্মদিন আরও বড় করে, জাঁক-জমক করে করবে। এক গাদা আত্মীয় স্বজন চিড়িয়াখানার কৌতূহল নিয়ে বিনয়বাবুকে দেখে বিস্মিত হবে — বিনয়বাবুর দীর্ঘ জীবনের জন্যে মেডিকাল সায়েন্সের প্রশংসা করবে। আবার কেউ প্রতিবাদ করে বিনয়বাবুর রেগুলার হ্যাবিটগুলোর প্রশংসা করবে — তাঁর এতকাল বেঁচে থাকাটাই সেদিন একটা উত্তেজিত আলোচনার বিষয় হবে। নূতন আমন্ত্রিতরা শুধু জানবে, এই বৃদ্ধ এতকাল বেঁচে আছে বলে বাঁচবার একটা উৎসব করছে — যেন সাইকেলে আটাত্তর ঘণ্টা থাকবার প্রতিযোগিতা, যে টিকে থাকে — সকলে তাকে মালা দেয় — তেমনি বাঁচবার প্রতিযোগিতায় বিনয়বাবু স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূকে হারিয়ে দিয়ে আটাত্তরে পদার্পণ করাতে তাঁকে বেঁচে থাকবার জন্যে

মালা দেওয়া হচ্ছে। পুরানো যারা নূতন করে আমন্ত্রিত হবে, তারা বিনয়বাবুর এখনও টিকে থাকাতে বিচলিত হয়ে পড়বে। তাঁদের কাছে বিনয়বাবু একটা অনাবশ্যক দীর্ঘ জীবনের প্রতীক মাত্র। আত্মীয়-নবাগত- রবাহূত — পুরানো সকলের চোখে বিনয়বাবুর এতকাল বেঁচে থাকবার বিস্ময়কে কল্পনা করে তিনি ভাবলেন, যেন তিনি পরশুর আগেই জীবন শেষ করতে পারেন। ঢাকঢোল পিটিয়ে তিনি যে বেঁচে আছেন একথা জানাতে তার সমস্ত মন বিষিয়ে ওঠে। জন্মদিন না হবার দুশ্চিন্তায় মন যে ব্যাকুল ও বিক্ষুব্ধ হয়ে কচি কচি মুখ, যৌবনদীপ্ত চোখ ও জীবনের উষ্ণ স্পর্শ কামনা করেছিল — একথা ভাবতেই যেন নিজের ওপরে বিতৃষ্ণায় সমস্ত শরীর ঘিন ঘিন করে ওঠে। এখন যে তিনি জন্মদিনকে ছোট করতে বলবেন — তারও উপায় নেই। ভাববে, রাগ করে ছোট করতে বলবেন — খুবই অভিমান হয়েছে দাদুর। কোথাও গিয়ে --- না হোক, পুরীও যেতে পারেন — কিন্তু এরা ভাববে, এতটুকু ভুলের জন্য দাদু আমাদের এতবড় শাস্তি দিল - — আমরা তো বরাবর জন্মদিন করেই এসেছি। তিনি যে এদের বলবেন, জন্মদিনের কথা তাঁরও মনে ছিল না। ওরা বলতেই মনে পড়ল। কত জন্মদিন গেল বল দিকি। কিন্তু তা বললে মিথ্যা বলা হয। ছোটবেলা থেকে মিথ্যা বলাকে তিনি ঘৃণা করে এসেছেন। মিথ্যা বলতে হয়েছে সাবাজীবনে বিস্তর — কিন্তু বলে কোনোদিন শান্তি পাননি — অনেকক্ষণ মন খচ খচ করেছে। এখন আর মিথ্যা বলেন না। আসলে দিনে কটা কথাই বা বলেন। কোন কোন দিন — যদি বৃষ্টির জন্যে সকাল বিকাল বের হতে না পারেন — শর্মিলা যদি দুপুরে না আসে — তবে হয়ত সারাদিন কথা-উপবাস। এমন কথা-উপবাস আজকাল প্রায়ই ঘটে। এমন কথা-অনশনের মধ্যে ওদের জন্যে মিথ্যে বলতে ইচ্ছে হয় না। ওদের ভয়ে মিথ্যে বলা, না অসম্ভব। শর্মিলা তাগাদা দেয় — তুমি আর দাঁড়িযে থেক না। টিকিট পাল্টে আনো — কেকের অর্ডার.... বাজার, বাজার আগামীকাল বিকেলে করলেই চলবে.... ওদিকে কত জায়গায় নেমতন্ন করতে যেতে হবে.... রাজ্যেব কাজ .... সব কাজই তো বাকী। চল, চল।

শর্মিলা সুকুমারকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

বিনয়বাবু এসে ইজিচেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন। আর কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। নিষেধ করবার উৎসাহও ছিল না। এতক্ষণের উত্তেজনা ও বিষণ্ণতা যেন তার সমস্ত শক্তি চুষে নিয়ে গেছে। নিজেকে শক্তিহীন দুর্বল.... ও এত দুর্বল যে কিছু ভাবতে সাহসও হচ্ছে না .... ইচ্ছেও করছে না। ওদের নিষেধ করবার শক্তি নেই অথচ জন্মদিন মেনে নিতে সমস্ত অন্তর যেন বিতৃষ্ণায পূর্ণ হয়ে গেছে। ভাবতেই শরীর সঙ্কুচিত। অথচ উপায় নেই।

ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর কনুই রেখে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে চোখ বুজে থাকেন। নিজেকে অসহায়.... একা .... সমস্ত জীবনটা নির্বান্ধব। কী ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে সমস্ত জীবনটা কাটালেন। বেঁচে থাকবার খেসারত হিসেবে বাঁচবার লজ্জা গোপন করবার উপায় নেই। তিনি ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। কী লাভ হল এতদিন বেঁচে। বেঁচে থেকে

তিনি জীবনের কোন্ উদ্দেশ্য পূরণ করেছেন। আজ বেঁচে থাকবার এই নির্যাতন সহ্য করেই বা তাঁর কি লাভ হচ্ছে। একটি মাত্র জীবন — তাও একটা সফল অপচয়। একটা উদ্দেশ্যহীন সান্ত্বনাহীন অত্যাচার-সর্বস্ব বেঁচে থাকা। অর্থহীন বেঁচে থাকা — অর্থহীন অন্ধকার নিয়ে সারাজীবন কাটানো। ভয়ানক অর্থহীন নীরবতার মধ্যে তিনি চিরকাল কাটালেন। বড্ড ক্লান্তি লাগে। ঘুম ঘুম ভাব বোধ করেন। হঠাৎ দেখেন .... তিনি মরছেন। ব্যাকুল হয়ে দরজার দিকে তাকান। ..... কই, কোথায় প্রতিমা? প্রতিমা তো ছুটে বুকের ওপর উপুড় হয়ে কাঁদছে না। কেউ কোথাও নেই। তিনি একা একা গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। তবু, একটা ক্ষীণ আনন্দের রেখা অন্ধকারের মধ্যে ছোট আলোর শিখার মত দেখা যাচ্ছে — যাক্ পরশু আর জন্মদিন দেখতে হবে না। ...... তিনি ভাবলেন — অন্ধকারে ডুবতে ডুবতেই ভাবলেন — এবার তিনি একটা ফটো আর মালা হয়ে যাবেন। ফটোগুলোর দিকে তাকাতে চান। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তিনি ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি স্বপ্ন দেখছেন — না জেগে আছেন। জীবন মানেই চেতনা। এখনও কেন চেতনা আছে — কেন ভাবতে পারছি .... অন্ধকার কখন চেতনাকে লুপ্ত করে দেবে। অন্ধকার.... গভীর অন্ধকার।

হঠাৎ চম্‌কে বিনয়বাবু জেগে ওঠেন। ঘেমে গেছেন। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। বিকেল হতে আরম্ভ করেছে। ভাবলেন, তিনি জন্মদিনের দুঃস্বপ্ন আর মৃত্যুর স্বপ্ন নিয়ে কতকাল আর কতকাল ....। মৃত্যুর স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে? আজ আর মৃত্যুকেও তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না।